বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

দ্বিতীয় বর্ষ■সংখ্যা - ৪ - নভেম্বর ২০১২

বিশেষ নিবন্ধ ঃ ডেঙ্গু কী এবং কেন ?

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান ও কুসংস্কার

- ডেঙ্গু প্রসঙ্গে
  প্রফেসর ডা. বিভূতি সাহা'র সাক্ষাৎকার
- সাপ নিয়ে বললেন শ্রী রাজু সরকার

- মানুষের দাঁতের বিবর্তন আমাদের কি শেখায় ?
- দুবরাজপুরে ডাইনি হত্যা ঃ বিজ্ঞান মনস্ক'র তদন্ত
- সত্যি ভূতের গল্প

এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত কলাম

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান ও কুসংস্কার

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি যে বর্তমান সমাজের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি সে বিষয়ে বোধ করি কাহারো সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ আজ মহাকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে পাড়ি দিতেছে, সমুদ্রের গভীরে যাইয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতেছে, অত্যাধুনিক মহাকাশ যান হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়া পৃথিবীর আবহাওয়ার সুনিপুণ ভবিষ্যৎবাণী করিতেছে, ভূকম্পনের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের অগ্রিম সতর্কীকরণের প্রযুক্তিও আজ বিজ্ঞান করায়ত্ত করিয়াছে, মানুষের আয়ুষ্কাল দ্বিগুনাধিক করিতে সক্ষম হইয়াছে। পরমাণুর অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের হাতে ধরা দিতেছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তথা প্রাণ সৃষ্টির গূঢ় রহস্য সন্ধানে সে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। বলা যাইতে পারে বিজ্ঞানের সহযোগিতায় মানুষ আজ আপনাকে পৃথিবীর অধীশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুবিশাল এই পৃথিবী আজ তাহার কাছে নিতান্তই এক ক্ষুদ্র গোলকসম।

এই উন্নতি কয়েক লহমায় কোন দৈব বলে ঘটিয়াছে তাহা নহে। কোন ময়দানব মুহূর্তের খামখেয়ালীপনায় পাহাড় কাটিয়া নগর পত্তন করিয়াছে এমনটাও নহে। বিজ্ঞানকে সহায় করিয়া আপন বাহুবলেই সে গড়িয়া তুলিয়াছে সভ্যতার ইমারত। সামাজিক শ্রম ব্যাতীত যাহা নেহাতই অসম্ভব। বিজ্ঞানের বিজয় রথের যাত্রা শুরু হইয়াছিল সভ্যতার ঊষালগ্ন হইতেই। ইহার গতি কখনও মন্থর, কখনও দ্রুত, আবার কখনও বা ইহার গতিতে ঘটিয়াছে উল্লম্ফন। সমাজ বিকাশের সহিত বিজ্ঞানের বিকাশের একটি সুনিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে বিজ্ঞানের বিকাশ যেমন সমাজের বিকাশকে ত্বরান্বিত করিয়াছে, তেমনই সমাজের বিকাশও বিজ্ঞানের বিকাশকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। বিজ্ঞান তথা সমাজের বিকাশটিও একটি বিজ্ঞান, সেই কারণেই ইহাকে 'সমাজ বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

যাহাই হউক, আধুনিক বিজ্ঞানের এই বাড়বাড়ন্তর যুগে সমাজের কতিপয় মানুষই কেবল ইহার ফল ভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছে। অপরদিকে, সমাজে আপামর সাধারণ মানুষের একটি বৃহৎ অংশ বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অথচ, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কায়িক এবং মানসিক শ্রমদানের বিচারে তাহাদের অবদানই সর্বাধিক যাহা যুগের পর যুগ ধরিয়া লক্ষিত হইতেছে। তাহাদের অবস্থা অনেকাংশে সেই বাতিওয়ালার ন্যায় যাঁহারা রাজপথ আলোকিত করিয়া বেড়ান কিন্তু নিজেদের গৃহে বিরাজ করে দুঃসহ অন্ধকার। সেই অন্ধকার অজ্ঞানতার অন্ধকার, সেই অন্ধকার অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকার, সেই অন্ধকার কুসংস্কারের অন্ধকার। একদিকে যেমনই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির লাগামবিহীন বাজার কেন্দ্রীক বিকাশ সংঘটিত হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই অজ্ঞানতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কারের জমাট কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে আপামর মানুষের চেতনা। ইহা একটি অদ্ভুত বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য প্রমাণ করিতেছে যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিকাশের সহিত বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষের কোন যোগযোগ নাই, যদিও এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন দায়, দায়িত্ব অথবা প্রয়োজনীয়তা কোনটাই নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে রাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে তাহা প্রতিফলিত হইত। বর্তমান পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান, অবিজ্ঞান সকলই শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করিতেছে। আবার শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে একই বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন উপসংহার পঠিত হইতেছে, তাহার উদাহরণও কম পড়ে নাই। বর্তমান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ যখন সদর্পে ঘোষণা করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাঁহার দেশ জনগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করিয়াছে তখনই গুণিন, জানগুরুর মদতে ডাইনি হত্যা, ওঝার ঝাড় ফুঁক, ভূত ছাড়ানো, ব্যাঙের বিবাহ প্রদান করিয়া খরার কবল হইতে রক্ষা পাইবার প্রচেষ্টার ন্যায় অসংখ্য ঘটনা তাঁহাদের কপোলে সপাটে চপেটাঘাত করিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বিভিন্ন মহলের ক্ষোভ তেমন তেমন স্তরে উন্নীত হইলে প্রশাসন দোষী ওঝা, গুণিন বা জান গুরুকে গ্রেফতার করিয়া তাহার দায়িত্ব পালন করে। অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদ্‌পদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তখন অন্য ওঝা বা গুণিনকে খুঁজিয়া লয় কারণ হত-দরিদ্র মানুষজন যদি কুসংস্কারমুক্তও হন তিনি তাঁহার আপনজনকে বাঁচাইবার জন্য নিরুপায় হইয়াই ওঝা, গুণিনের নিকট যাওয়াটাকেই

শ্রেয় বলিয়া মনে করেন কারণ ইহা তাঁহার অর্থনৈতিক ক্ষমতার সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের প্রশ্নে রাষ্ট্রের উদাসীনতা এবং অপারগতা সচেতন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ দিগকে এই কাজে ব্রতী হইতে দায়বদ্ধ করে। আনুমানিক শতাধিক বৎসর পূর্ব হইতে বিভিন্ন ধারার বিজ্ঞান সংগঠনগুলি গঠিত হইতে থাকে এবং তাহারা কুসংস্কার বিরোধী প্রচার চালাইয়া মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করিবার প্রয়াস রাখিয়া আসিতেছে। পরবর্তীকালে আরও অনেক বিজ্ঞান সংগঠন গঠিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে। কিন্তু কেহ এই কথা বলিতে সাহস দেখাইবে না যে মানুষের মন হইতে কুসংস্কার নির্মূল হইয়া গিয়াছে, কারণ ইহা সম্ভব নহে। বিগত শতাধিক বৎসরে যেহেতু এদেশে আর্থ সামাজিক পটভূমিকায় বিশেষ কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই, তাই মানুষের চেতনারও বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তাই কুসংস্কার টিকিয়া থাকার পিছনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষই দায়ী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্বে বিষয়টি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে নচেৎ কুসংস্কার, কুসংস্কার বলিয়া হাহাকার করিলেও কুসংস্কার মানব চেতনায় আরও গভীরভাবে বাসা বাঁধিবে।■

মাননীয় সম্পাদক সমীক্ষণ
মহাশয়,

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র সমীক্ষণ (সং–৪, নভেঃ ১১) সংখ্যাটি পেলাম। সমীক্ষণের–তথ্য, রচনা, সংবাদ, সম্পাদনা আমাকে তৃপ্ত করেছে। আমি সমীক্ষণের সমৃদ্ধি কামনা করি।

শেষে সমীক্ষণের সকল পাঠক, লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক, শুভানুধ্যায়ীদের শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাই।

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২ নমস্কারান্তে–
নবপল্লী, বারাসাত সম্রাট চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)

সম্পাদকের মতামত

শ্রীযুক্ত সম্রাট চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সমীক্ষণের পক্ষ হতে আপনার চিঠির জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনার চিঠি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আশা করি আগামীদিনে আপনি সমীক্ষণের রচনাগুলির উপর বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ রাখবেন।

বহুপাঠক বন্ধু আমাদের সাথে দূরভাষে যোগাযোগ করেন বা সাক্ষাতে পত্রিকার বিভিন্ন রচনা সম্বন্ধে তাঁদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে থাকেন। সেই সমস্ত পাঠকবন্ধুদের কাছে আমাদের অনুরোধ, দয়া করে আপনার লিখিত মতামত তা সে সমর্থনমূলকই হোক বা সমালোচনামূলকই হোক, পত্রিকার অফিসে পাঠিয়ে দিন। আমরা এর যথাযথ উত্তর দেব।

আমরা একথাও জানতে পেরেছি যে ঠাকুরপুকুর, বেহালা অঞ্চলের কয়েকটি স্কুলে কোন একটি বিজ্ঞান সংগঠন তাঁদের মতামত প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সমীক্ষণ পড়তে মানা করেছেন। প্রচারে তাঁরা বলেছেন যে সমীক্ষণের রচনাগুলি ভ্রান্ত। আমরা উক্ত বিজ্ঞান সংগঠনের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে সমীক্ষণ পত্রিকা এবং বিজ্ঞান মনস্ক সংগঠন সম্পর্কে কোন সমালোচনা বা বিরোধিতা থাকলে নিজস্ব মুখপত্রের মাধ্যমে তা করুন অথবা সমীক্ষণে তা পাঠান। আমরা দায়িত্ব নিয়ে জানাচ্ছি যে আপনাদের মতামত প্রকাশ করে তার জবাব দেব।■

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক'র স্টলে আসুন এবং সমীক্ষণ ও অন্যান্য পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করুন।

৩০শে নভেম্বর, ২০১২ থেকে ৯ই ডিসেম্বর, ২০১২

উত্তরবঙ্গে বিজ্ঞান মনস্কর যোগাযোগ

শ্রীমতী দীপিকা রুদ্র (শিলিগুড়ি)
যোগাযোগ নং – ৯৪৩৪৮১১৩২৬

দ্বিতীয় বর্ষ❖সংখ্যা - ৪❖নভেম্বর ২০১২

মানুষের দাঁতের বিবর্তন আমাদের কি শেখায় ?

–সমীরণ মল্লিক

প্রাণীর শরীরের প্রত্যেকটি অংশ কোনা না কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং তার জন্যই শরীরে তার অবস্থান এক একরকম হয়। যেমন চোখ দিয়ে আমাদের চারিপাশ দেখি, তাই এর অবস্থান একদম উঁচুতে মুখের উপর কপালের ঠিক নীচে। যদি চোখ প্রাণীর শরীরের নিম্নভাগে অবস্থান করতো, তাহলে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কোনো প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব হত না। এক অর্থে তার অবস্থানই তখন তার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দিত। অনেকে ভাবতে পারেন কে ঠিক করে দিল তবে প্রতিটি অঙ্গের এমন সুনিপুণ অবস্থান! প্রাণীর অঙ্গের বিকাশের বিজ্ঞানকে অনুধাবন না করলে অনেকেরই মনে হবে এর পিছনে কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির হয়ত হাত রয়েছে।

কেন এই বিষয়

যদি দাঁতের কথাই বলা যায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে দাঁতের বিষয়ে আমরা কি জানি? খুব বেশি হলে জানি যে আমাদের কয়টি দাঁত, দাঁত আমরা খাবার কাজে ব্যবহার করি এবং এটি না থাকলে হয়তো আমরা অনেক শক্ত খাবার খেতেই পারতাম না। কিন্তু কিভাবে এল এই দাঁত কিংবা এটি আসলে কি দিয়ে তৈরী অথবা কিভাবে বৃহদাকার আকৃতি হতে তা প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানের এমন সুগঠিত রূপ পেল তা আমাদের সচরাচর মনে হয় না। মানুষের কথা যদি বলি তাহলে মানব সভ্যতার বিকাশের সূচনালগ্নে আগুনের আবিষ্কারের সাথে সাথে দাঁতের প্রয়োজনীতা পাল্টাতে থাকে। আমরা জানি আগুনের আবিষ্কারের ফলে কাঁচা মাংস পুড়িয়ে খাওয়ার অভ্যাস চালু হয়েছিল, ফলে খাদ্যাভ্যাস বিকাশের সাথে তথা মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে দাঁতের বিবর্তন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই মানুষের দাঁতের বিকাশের নিয়মগুলি জানতে হলে দাঁত কি, কি নিয়ে তা তৈরী এবিষয়ে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক।

দাঁত কি ও কেন ?

প্রচলিত অর্থে দাঁত হল শরীরের এক প্রকার শক্ত অংশ যাকে হাড়ের সাথে তুলনা করা যায়। দাঁত ও হাড়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকলেও দাঁত কিন্তু হাড়ের চেয়েও শক্ত। হাড় হল ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য উপাদান যেমন ফসফরাস ইত্যাদি দিয়ে তৈরী এবং হাড়ের ভিতর মজ্জা থাকে। অন্যদিকে দাঁত মূলত তিনটি উপাদান বা অংশের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলি নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব। তবে তার আগে পাঠকদের একটি বিষয় জানা দরকার। দাঁতের প্রত্নতত্ত্ববিদরা সাম্প্রতিককালে একটি নমুনা পেশ করেছেন যা শারীরিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজে এসেছে। একে 'পপুলেশন বায়োলজি' বলা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার তথ্যসূত্র থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক বা গবেষকরা বলেছেন যে দাঁতের আকার ও আকৃতির সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের বিবর্তনের উপর নির্ভর করে।

দাঁতের বিবর্তন ও মানুষের বিবর্তন-এর মধ্যে সম্পর্ক

দাঁতের বিবর্তনের যথাযথ তথ্য এখনো জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যাভ্যাস এবংমস্তিষ্কের বিবর্তনের সাথে সাথে দাঁতের আকার ও গঠনের পরির্বতন ঘটেছে। গবেষণালব্ধ ফল থেকে অনুমান করা হয় যে সভ্যতা এবং খাদ্যাভ্যাসের সাথে সম্পর্কিত ভাবে দাঁতের আকার ও আকৃতির সরলীকরণ ঘটেছে। চারটি মানবগোষ্ঠীর উপর গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছিল। তারা হল গোন্ড (Gond), মাহাদেও কোলি (Mahadeo Coli), মাহার (Mahar) এবং মারাঠা (Maratha)। তবে দাঁতের আকৃতি চোয়ালের আকৃতির সাথে সম্পর্কিত। চোয়াল যত বড় হবে, দাঁতের আকার ও তত বড় হবে। অর্থাৎ উভয়ে পরস্পরের সাথে সমাণুপাতিক ভাবে সম্পর্কিত।

সাম্প্রতিক কালে দাঁতের বিকাশের উপর গবেষণা করে তিনটি তথ্য পাওয়া গেছে।

(১) উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই বিকাশ পরিষ্কার ভাবে লক্ষ্য করা গেছে এবং এটি দেহের আকার, আকৃতি ও ওজনের সাথে সম্পর্কিত। এটি প্রমাণ করে যে ছোট আকার এবং মস্তিষ্ক বিশিষ্ট অস্ট্রালোপিথেকোসদের দাঁতের পরিবর্তন হয়েছিল দেহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে।

(২) মানুষের বৃদ্ধি কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে জানা যায়।

(৩) বিবর্তনের পথ ধরে অস্ট্রালোপিথেকাস এবং এপ্

থেকে উন্নত 'হোমো' প্রজাতির উদ্ভব ঘটে।

এই তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে যে গত দু-লক্ষ বছরের মধ্যে মানুষের যা বিবর্তন, পৃথিবীতে অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে এই বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। যদিও মানুষের এই বিবর্তন শুধুই প্রকৃতিনির্ভর ছিলনা যা অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তবে দাঁতের বিবর্তনকে ভালোভাবে বুঝতে হলে দাঁতের গঠন-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

দাঁতের গঠন

আগেই বলেছি দাঁতের মূলত তিনটি অংশ থাকে।

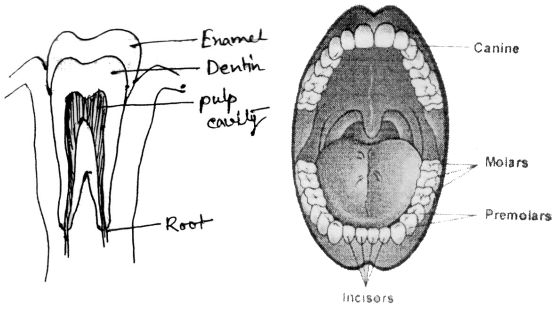

এনামেল, ডেনটিন ও পালপ্ ক্যাভিটি। এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ডেনঠিন। দাঁতের একেবারে বাইরে যে সাদা অংশটি থাকে তার নাম এনামেল, এটি দাঁতের তো বটেই এমনকি শরীরেরও সবচেয়ে শক্ত অংশ। বাইরে থাকে বলে এটির কাজও থাকে ভিতরের অপেক্ষাকৃত নরম অংশকে রক্ষা করা।

এনামেলের ঠিক নিচের অংশই হল ডেনটিন এবং ডেনটিনের মধ্যের অংশই হল পালপ্ ক্যাভিটি যা রক্ত ও নার্ভের সাথে সমন্বয় সাধন করে এবং দাঁতকে যাবতীয় পুষ্টি ও অনুভূতি প্রদান করে।

দাঁতের জন্ম ও রূপান্তর

দাঁতের সৃষ্টি হল কিভাবে এর সঠিক উত্তর আজও জানা যায়নি। তবে প্রয়োজনের জন্যই হয়তো এর আবির্ভাব ঘটেছে এমন অনুমান করা হয়। জীবজগতের সমস্ত প্রাণীর অভিযোজন ঘটেছে একটা সময় অন্তর। একই ঘটনা দাঁতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।জীবাশ্মবিদরা (Palaeontologists) এবং নৃতত্ত্ববিদরা (Anthropologists) তাঁদের দীর্ঘ গবেষণার মধ্য দিয়ে মনে করেন যে, সমস্ত প্রাণীর অভিব্যক্তি ঘটেছে দাঁতের উপর নির্ভর করে। ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে দাঁতের আকার ও আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। এরজন্য প্রকৃতিও অনেকটা দায়ী। কারণ প্রকৃতির সাথে বিভিন্নভাবে মানিয়ে চলার জন্য প্রাণীর শরীর অভিযোজিত হয়েছে। দাঁতও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে দাঁতের আকার ও আকৃতির পরিবর্তনের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মস্তিষ্ক এবং চোয়াল। মস্তিষ্ক ও চোয়ালের সাথে সামঞ্জস্য রাখতেই দাঁতের রূপান্তর ঘটেছে।

অন্যদিকে বলা যেতে পারে যে আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর আগে প্রাণীদের আকার ছিল বিশাল। সে সময়ে মেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে যারা মাংসাশী ছিল তাদের ক্যানাইন দাঁতের আকৃতি বিশাল ছিল। ক্যানাইন হল সবচেয়ে ধারালো দাঁত যা খাদ্যকে ছিঁড়তে সাহায্য করে। যেহেতু সেসময়ে তাদের বড় বড় প্রাণী শিকার করতে হত, তাই ক্যানাইন দাঁতের আকার প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। পাশাপাশি জেনে রাখা দরকার যে প্রত্যেকটি প্রাণীর দাঁতের আকার ও আকৃতির জন্য জিনও অনেকাংশে দায়ী। মানুষের ভিতর দেখা যায় যে একই সময়কালের মধ্যে দুটি মানুষের দাঁতের আকার আলাদা আলাদা হতে পারে। এর থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলা যেতে পারে যে জিনের এখানে গুরুত্ব আছে। আবার এখানেও ভেবে দেখুন জিনের পরিবর্তন সূচিত হয় মিউটেশনের মাধ্যমেই। এই মিউটেশন আবার মানুষের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়েছে। তাই অন্যান্য প্রাণীদের প্রকৃতি নির্ভর মিউটেশনের চেয়ে মানুষের মিউটেশন উন্নততর জিনগত বিবর্তনকেই সূচিত করেছে। ফলে মানুষের দাঁতের আকৃতি ও গঠনের রূপান্তর অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অনেকধাপ এগিয়ে গেছে।

মানুষের দাঁতের রূপান্তরের পিছনে সামাজিক শর্ত্তটি কি ছিল ?

মানুষের শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের বিকাশ ঘটেছে তার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। একদিকে মানুষ তার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যেমন সোজাভাবে দাঁড়তে শিখেছে অন্যদিকে ঠিক তেমনভাবেই তার শরীরের পিছনের লেজ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দাঁতও এরমধ্যে ব্যতিক্রম নয়। মানবসভ্যতার বিকাশ সূচিত হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে খাদ্যাভ্যাসের সাথে সম্পর্কিত ভাবে। খাদ্যাভ্যাস যত উন্নত হয়েছে তত প্রাণীজ প্রোটিনের সংযোজন একদিকে যেমন তার মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটিয়েছে অপরদিকে রোগ প্রতিরোধক হিসাবেও কাজ করেছে। কাঁচা মাংসের চেয়ে আগুনে পোড়ানো মাংসে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা স্বাভাবিক ভাবেই অনেক কম।

সাধারণভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে আমাদের দাঁত সারজীবন ব্যাপি একবারমাত্র প্রতিস্থাপিত হয়, অন্যদিকে হাঙর বা অন্যান্য প্রাণীর দাঁত অনেকবার প্রতিস্থাপিত হয়। এর কারণটিও হল প্রয়োজন বা ব্যবহার। আগেই বলা হয়েছে যে দাঁতের আকার চোয়ালের আকার-আকৃতির ওপর নির্ভর করে। তাই ছোট বয়সে মানুষের দাঁতের আকার ছোট থাকে তার ছোট মস্তিষ্কের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। পরবর্ত্তীকালে মানুষের মস্তিষ্কের আকার বাড়তে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর স্থির হয়। এইভাবে আকারে বাড়ার সময় মস্তিষ্কের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য মানুষের দাঁত ছোটবেলায় (৭ থেকে ৯ বছরের মধ্যে) পড়ে যায় যাকে আমরা 'দুধের দাঁত' বলে থাকি। অপরদিকে হাঙর বা অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের দাঁত বার বার প্রতিস্থাপিত হয় তার প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে। হাঙর বা অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর কাঁচা মাংস খেতে হয় বলে দাঁতের ক্ষয়ও বেশী। ফলে তার ধারও ক্রমান্বয়ে কমে যায়। তাই এক্ষেত্রে তার প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হয় বার বার। একই সাথে বলা যায় যে মানুষের বিভিন্ন প্রকার দাঁতের আকারের বিভিন্নতাও একইভাবে প্রয়োজন ও ব্যবহারের দ্বারাই বিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ পেয়েছে। যে সমস্ত প্রাণীরা কেবলমাত্র মাংসাশী, তাদের ক্যানাইন দাঁতের আকারও বড় থাকে স্বাভাবিক কারণেই। আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর আগে এইসব মাংসাশী প্রাণীদের দাঁত আরও বড় ছিল তাদের দেহের আকার ও শক্ত কাঁচা মাংস চিবিয়ে খাবার প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে।

দাঁতের রূপান্তর থেকে ভাষার রূপান্তর

আদিম যুগে আগুনের ব্যবহার ও সংরক্ষণ মানুষকে এগিয়ে দিয়েছিল অনেকটা। মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পাবার যে বাস্তব চাহিদার সৃষ্টি হয়েছিল, পোড়া ও সিদ্ধ খাবার নরম হওয়ায় চোয়াল আরও ছোট হয়ে তাকে সম্ভব করে তুলল। চোয়াল ছোট হলেও পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসের উন্নতির সাথে সাথে প্রয়োজনভিত্তিক ভাবে দাঁত আরও ছোট হয়ে যাওয়ায় জিভ নড়ার জন্য যথেষ্ট জায়গা পেল। ফলে উচ্চারণ ধ্বনি স্পষ্ট হল। এভাবে মানব চোয়াল ও দাঁতের রূপান্তরের ফলস্বরূপ ভাষার রূপান্তর তথা ধ্বনির ও স্বরপ্রক্ষেপণের রূপান্তর সূচিত হল।

এছাড়া বাস্তব জীবনে স্বরপ্রক্ষেপণ ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে দাঁতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দাঁত পড়ে গেলে উচ্চারণ স্পষ্টতা হারায়। আবার ছোটবেলায় বাংলা ব্যকরণ পড়তে গিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকার বর্ণের পরিচয় পেয়েছি। যেমন নাসিক্য বর্ণ, তালব্য বর্ণ ইত্যাদি, এদের মধ্যে 'দন্ত' বর্ণ নামেও একটি ভাগ ছিল, যেবর্ণগুলিকে উচ্চারণ করতে গিয়ে দাঁতের স্পর্শ অনিবার্য এবং ইনসিজর নামক দাঁতের প্রয়োজন পড়ে। তাই ভাষা বা উচ্চারণের ক্ষেত্রে দাঁতের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে।

মানুষের দাঁতের এই বিবর্তন আমাদের কি শেখায় ?

বন্য জীবন থেকে ধীরে ধীরে সভ্য হওয়ার পিছনে মানুষের ক্ষেত্রে যে কারণটি ছিল সেটি হয় অন্যান্য বন্যপ্রাণীর চেয়ে আলাদা নয়ত পরিমাণগতভাবে মানুষের উপর তার প্রভাব বেশী। দাঁতের বিবর্তন আমাদের কি শেখায় বললে অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন যে দাঁতের গঠনতান্ত্রিক বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য দিয়ে এর উত্তর দিতে বলা হচ্ছে। ঘটনা কিন্তু ঠিক তা নয়, এই লেখাতেই আমরা বলেছি যে প্রতি দুটি প্রাণীর দাঁতের বৈশিষ্ট্য আলাদা, কিন্তু যে সাধারণ শিক্ষাটি বিবর্তন থেকে উঠে আসে তা হল – কি সামাজিক কারণ ছিল যা-ই কিনা অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের বিবর্তনকে আলাদা করেছে। কি পার্থক্য আছে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের? পার্থক্য একটাই, তা হল সামাজিক শ্রম দেওয়া যা মানুষই একমাত্র পেরেছে আর পেরেছে বলেই ডারউইনের কেবলমাত্র প্রকৃতি নির্ভর প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। বহু অতিকায় জীব (যেমন-ডাইনোসর, ম্যামথ ইত্যাদি) অবলুপ্ত হয়েছে যদিও মানুষ তাদের তুলনায় ক্ষুদ্র জীব হলেও সামাজিক শ্রমের মাধ্যমে মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটিয়ে সে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল প্রকৃতির নিয়মকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার। একইভাবে সে খাদ্যাভ্যাসকেও করেছে যুগোপযোগী। প্রাণীদের মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে কঠিন ও তরল সমস্ত রকম বস্তুকেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। চোয়ালের ভূমিকা বন্য প্রাণীদের মতো থাকেনি। অখণ্ড বস্তুকে নরম, পিচ্ছিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোতে বিভক্ত করার ফলে দাঁতকে আর আগের মত অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে হয়নি। ফলে সেই সুবিধাকে সামনে রেখেই মানুষের ক্ষেত্রে মিউটেশন তথা বিবর্তনের দিক সূচিত হয়েছে। তাই বর্তমানে অন্যান্য সমস্ত গৃহচালিত ও বন্য প্রাণীর চেয়ে মানুষের দাঁতের গঠন সম্পূর্ণরূপে আলাদা যা কিনা মানবসভ্যতার সূচনা লগ্নে অবিরামভাবে নিয়োজিত সামাজিক শ্রমকেই মনে করিয়ে দেয়। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে তা আজও অনুপস্থিত।■

সাক্ষাৎকার

সাপ নিয়ে বললেন শ্রী রাজু সরকার

[উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরের দেশবন্ধু পাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা রাজু সরকার একজন অতিদক্ষ সর্প ও পশুপাখী বিশারদ। তাঁর তৈরী সংগঠন 'কেয়ার ফর নেচার'-এর উদ্যোগে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উত্তরবঙ্গের বহু মানুষকে সাপের কামড়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এলাকার মানুষের সাথে কথা বলে জানা গেল যে রাজুবাবু ছেলেবেলা থেকেই প্রচন্ড সাহসী ছিলেন। সাপ ছাড়াও বাজপাখী, চিল, শকুন প্রভৃতি নানা পশুপাখী প্রেমী তিনি। নানা পশুপাখী, বিশেষতঃ সাপ নিয়ে তিনি নিরন্তর গবেষণা চালাচ্ছেন, অধ্যয়ন করছেন। উত্তরবঙ্গের বহু মানুষই তাঁকে চেনেন এবং শ্রদ্ধা করেন বা ভালবাসেন। 'বিজ্ঞান মনস্ক উত্তরবঙ্গ শাখা'র পক্ষ থেকে তাঁর সাথে একটি সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়া হয় গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১২। আলাপচারিতার মাধ্যমে তিনি যা বলেছেন তা পাঠকদের সামনে রাখা হল। সম্পাদকমন্ডলী – সমীক্ষণ]

বিজ্ঞান মনস্ক – আপনার কি কোন সংগঠন আছে?

রাজু সরকার – আমার সংগঠন হল 'Care for Nature'।

বি. ম. – আপনাদের সদস্য কত?

রা. স. – সদস্য হাজার খানেক,তবে সাপ ধরতে পারেন ৩০-৪০ জন। এঁদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি।

বি. ম. – আপনাদের সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী?

রা. স. – প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা। আমরা বলি 'সাপ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও'।

বি. ম. – দেশে সাপের কামড়ে আক্রান্তের সংখ্যা কত?

রা. স. – এবছর সরকার ঘোষণা করেছে ১৪০০'র কিছু বেশী। কিন্তু রেকর্ডেড সংখ্যা ৫০,০০০-এর বেশী, আর নন রেকর্ডেড আরও বেশী।

বি. ম. – শিলিগুড়ি ও আশেপাশে সাপের কামড়ে আক্রান্তের সংখ্যা কত?

রা. স. – বছরে গড়ে ২০০টি; তবে মৃত্যুর হার আগের চেয়ে কমেছে। ২০০৯-২০১১ এই তিনবছরে একটিও মৃত্যু হয় নি। কিন্তু এবছর ইতিমধ্যেই ১৪ জন মারা গেছেন।

বি. ম. – এর কারণ কী?

রা. স. – প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের গাফিলতি। সরকারের ভূমিকার ত্রুটি।

বি. ম. – এই কাজ ছাড়া আপনি কি করেন? মানে আপনার পেশা?

রা. স. – আমি বায়ো সায়েন্স নিয়ে বি এস সি পাশ। প্রায় ১০-১১ বছর মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভের কাজ করেছি। বর্তমানে শিলিগুড়ি কলেজের নৈশ বিভাগের লাইব্রেরিয়ান।

বি. ম. – আপনার কাজের জন্য সরকারী কোন সহযোগিতা ...

রা. স. – আমি নিও না, সহযোগিতা চাইও না। নিজের অর্থেই তা করি।

বি. ম. – সাপ নিয়ে মানুষের মধ্যে কুসংস্কার কেমন?

রা. স. – সে তো আছেই। যতই বোঝান গ্রামের (এমনকি শহরেও) মানুষ সাপে কাটলে আগে ওঝার কাছেই যাবে, ডাক্তারের কাছে নয়। তবে আগে থেকে মানুষের সচেতনতা বেড়েছে। আমরা লাগাতারভাবে সচেতনতার কাজ করে চলেছি। গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রত্যেক শনি-রবিবার এই কাজ করি।

বি. ম. – আপনারা তো সাপ বা যে কোন প্রাকৃতিক পশু পাখী না মেরে রক্ষা করার কথা বলছেন, কিন্তু বিষাক্ত সাপ অথবা কোন হিংস্র পশুর আক্রমণ প্রতিহত করতে, সাপ বা পশু মারলে তা কি শাস্তিযোগ্য অপরাধ?

রা. স. – ইচ্ছাকৃতভাবে পশু-পাখী শিকার করলে বা মারলে তা অপরাধযোগ্য, তবে আত্মরক্ষার জন্য হিংস্র পশু বা বিষাক্ত সাপ মারলে তা অপরাধযোগ্য নয়। ভারত সরকারের ১৯৭২ সালের আইনে বলা আছে যে আত্মরক্ষার জন্য সাপ বা হিংস্র পশু-সাপ মারা যেতে পারে। বাস্তব ঘটনা হল – আমরা লোককে বলি যে সাপ না মেরে বনদপ্তর বা আমাদের খবর

দিন, আমরা সাপটা নিয়ে যাব। সাপকে কিছু না করলে সেও মানুষকে কিছু করে না। কিন্তু বাস্তবে বন দপ্তরের লোক খবর দিলেও আসতে চায় না। তাই অনেক সময় মানুষ বাধ্য হয়েও সাপ মারে।

বি. ম. – শুনেছি খবর পেলেই আপনারা সেখানে ছুটে গিয়ে সাপ ধরে নিয়ে আসেন?

রা. স. – আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা তা করি। শুধু সাপ নয় অন্য পশু পাখীও ধরি। বাড়িতে এনে তাদের রেখে দিই। খাওয়া দাওয়া করাই। তারপর বন দপ্তর এলে তাদের হাতে তুলে দেই। এইসব সাপ ও পশুদের খাওয়াতে ব্যাঙ, ইঁদুর, টিকটিকি, মুরগীর ছাঁট সব নিয়মিত জোগাড় করতে হয়। আমার মা প্রধানত এই দায়িত্ব পালন করেন।

[এই আলোচনা চলতে চলতেই ফোন আসে। শিলিগুড়ির মধ্যেই একটা পাড়ায় নাকি বাড়ির ছাদে বাজ পাখী এসেছে। বাড়ির লোক ভয় পেয়েছে। সাথে সাথে রাজু বাবু কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে চলে গেলেন এবং ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে এলেন এবং ধরে নিয়ে এলেন একটি বড় চিল।]

বি. ম. – এটি কি? কিভাবে ধরলেন?

রা. স. – এটি একটি চিল। পশুপাখী ধরা কোন কঠিন কাজ নয়। যে কোন পশু পাখীর একদিকে অ্যাটেনশন তৈরী করতে হয়। তাদের অ্যাটেনশন যখন বিশেষ একটি দিকে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় তখন উল্টো দিক থেকে সাপ বা অন্য কোন পশুকে সহজেই ধরা যায়। এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার ...

বি. ম. – এত যে সাপ ধরেন, আপনারা কি বুঝতে পারেন কোথায় কি সাপ আছে? এটা বোঝার উপায় কী?

রা. স. – দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন উপায় নেই।

বি. ম. – সাপুড়েরা যে বলেন, তাঁরা আগে থেকে জানতে পারেন এবং জানতে পেরেই এলাকায় এসে সাপকে ধরেন!

রা. স. – সাপুড়ে কেন (কয়েকটি জীবজন্তু ছাড়া) কারও পক্ষেই আগে থেকে নিশ্চিতভাবে সাপের উপস্থিতি বোঝা সম্ভব নয়। সাপুড়েরা এগুলি মিথ্যা প্রচার করে এবং অনেক সময় কোন এলাকায় আগে থেকে সাপ ছেড়ে দিয়ে তারপর তাকে ধরে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। কোথায় কোন সাপ আছে আগে থেকে কারও পক্ষেই তা বোঝা সম্ভব নয়।

বি. ম. – বিষাক্ত, স্বল্প বিষাক্ত ও নির্বিষ সাপ চেনার সহজ উপায় কী?

রা. স. – কোনও সহজ উপায় নেই। পড়াশুনো করেই তা জানা যায়। তবে লাইভ স্নেক বা জীবন্ত সাপ ছাড়া সাপ আসলে চেনা যায় না। প্রায় কাছাকাছি রকম নানা সাপ আছে। নানারকম ভাল বই আছে। এর মধ্যে Malcom A Smith এর লেখা Handbook of Indian Snakes, Ramulus Whitker & Ashok Captain এর লেখা Snakes of India বিখ্যাত। এছাড়া সাপ নিয়ে আরও অনেক বই আছে। ডিসকভারি এবং অ্যানিমেল ওয়ার্ল্ড চ্যানেলের নানা অনুষ্ঠান থেকেও অনেক কিছু শেখা যায়। আমি নিয়মিত তা প্রত্যক্ষ করি। এখনও প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিস শিখছি।

বি. ম. – সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য আপনি কোন বইপত্র লিখেছেন?

রা. স. – ডাক্তারদের সাহায্য করার জন্য 'সাপের কামড় বা 'Snake bite' বলে একটা বই লিখেছি। আর আমাদের রাজ্যের সাপ চেনার জন্য 'পশ্চিমবঙ্গের সাপ' বলে আর একটা।

বি. ম. – এতদিন ধরে সাপ নিয়ে প্রত্যহ ঘাঁটাঘাটি করেন। কোন বিপদের সম্ভাবনা ... (রাজু সরকারের মা পাশেই ছিলেন তিনি ওঁকে থামিয়ে বলেন)

রা. স. মা – বিপদের সম্ভাবনা কি বলছেন? ও মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে। গত বছর ৩১ আগস্ট সাপ ধরতে গিয়ে ওকে গোখরো সাপ কামড়ায়। ও ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসছিল, দেহ প্যারালাইস্‌ড হয়ে আসছিল। ওকে শিলিগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ও ডাক্তারকে বলে যে ১৬ ভায়েল অ্যান্টিভেনাম দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং ভেন্টিলেশনের দরকার পড়তে পারে। হাসপাতালের ডাক্তার শীর্ষেন্দু পাল বলেন তোমার কথা অনুযায়ী ১৬ টা অ্যান্টিভেনাম দিয়ে শুরু করছি। বেশ কিছুদিনের লম্বা চিকিৎসায় ও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়। একটা আঙুল বেঁকে গেছিল। চিকিৎসার পর সুস্থ হয়েছে। বাড়িতে ওকে সবাই আর এপথে আসতে বারণ করি। পাড়ার লোকও বারণ করে। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর ও আবার আগের মত একই কাজ করছে। যে কাজ করতে গিয়ে ও প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল। ফিরে এসে ও আবার সেই কাজই করছে। কারও বারণ শোনে নি।

রা. স. – শিলিগুড়ি হাসপাতালে আমার সাথে আর একজন রোগীও (সাপের কামড়ে আক্রান্ত) ছিল। সে তো সাপ ধরতে গিয়ে আক্রান্ত হয়নি। একাজ না করলেও আমি সাপের কামড়ে মরতে পারি। সুতরাং কাজ ছাড়ার কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না। মানুষকে বিষ দাঁতের ছোবল মারা ওদের উদ্দেশ্য নয়।

প্রধানত ভয়াক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য ওরা ছোবল মারে, কখনও আবার কোন শিকারকে ধরার জন্য (অবশ করার জন্য) ওরা কামড়ায়।

বি. ম. – সাপের কামড়ে কেউ আক্রান্ত হলে কি করা উচিৎ?

রা. স. – বিষাক্ত সাপ কামড়ালে একেবারে দেরী না করে হাসপাতালে গিয়ে অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসা শুরু করা উচিৎ। কামড়ানোর স্থানটি সোজা রাখা দরকার। হাত বা পা (যেখানে সাধারণতঃ কামড়ায়) সোজার রাখার জন্য হাল্কা বাঁধন দেওয়া যেতে পারে।

বি. ম. – হাসপাতালগুলিতে অ্যান্টিভেনাম থাকে? না রুগীর পরিবারকে তা দোকান থেকে কিনে দিতে হয়?

রা. স. – প্রাইভেটে কেনা-বেচার কোন নিয়ম নেই। একমাত্র সরকারী হাসপাতালেই তা পাওয়া যায়।

বি. ম. – আমাদের তো অন্য অভিজ্ঞতা। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এমনকি কলকাতার শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালেও রুগীর পরিবারকে অ্যান্টিভেনাম কিনে দিতে হয়েছে। এগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

রা. স. – এটা নিয়ম নয়। আপনাদের দাবী করতে হবে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন-এর নির্দেশ আছে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ২০১০ – গাইড লাইনস ফর ম্যানেজমেন্ট অব স্নেক বাইট – ডেভিড ও ওয়ারেল (পৃষ্ঠা ৮৭)তে স্পষ্ট নির্দেশ আছে।

বি. ম. – সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অ্যান্টিভেনাম রাখার নির্দেশ আছে?

রা. স. – সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেখানে রোগী থাকার ব্যবস্থা আছে সেখানেই অ্যান্টিভেনাম রাখার সিদ্ধান্ত আছে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্তটা আমি পরে আপনাদের মেইল করে পাঠাব।

বি. ম. – সমস্ত অ্যান্টিভেনাম কি একই। কোন সাপে কামড় দিয়েছে সেটা অনুসারে অ্যান্টিভেনাম দেওয়া হয় কি?

রা. স. – এখন সর্বত্র পলিভ্যারেন্ট অ্যান্টিভেনাম ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন সাপে কামড়াচ্ছে তার প্রকৃতি বিচার না করেই ব্যবহার হচ্ছে। এতে সাইড এফেক্ট প্রচুর থাকছে। বেশী ওষুধ দরকার হচ্ছে। মনোভ্যারেন্ট অ্যান্টিভেনাম হলে সাপ চিনে ব্যবহার করতে হত। সেক্ষেত্রে ডোজ নির্দিষ্ট হত, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম হত। আমার দাবী করেছি পলিভ্যারেন্টের পাশাপাশি মনোভ্যারেন্ট অ্যান্টিভেনাম হাসপাতালে থাকবে না কেন?

বি. ম. – এই পলিভ্যারেন্ট অ্যান্টিভেনাম-এর প্রয়োগ সাপ অনুসারে, ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে কি আলাদা হয় না এক?

রা. স. – উত্তরবঙ্গের বিষের রসায়ন দক্ষিণ বঙ্গের সাপের বিষের থেকে পৃথক। তামিলনাড়ু থেকে পশ্চিমবঙ্গে আলাদা। বিভিন্ন সাপের ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাত্রাও আলাদা। হু-র গাইডলাইন অব স্নেক বাইট ২০১০-এ এই বিষয়ে বিস্তারিত বলা আছে। বর্তমানে যে চিকিৎসা চলছে তা বিজ্ঞান সম্মত নয়।

বি. ম. – বিষাক্ত সাপের কামড়ে আক্রান্ত রোগীকে বাঁচানো শ্রেষ্ঠ পন্থা কী?

রা. স. – সরকারী হাসপাতালে যেখানে বেড এবং ভেন্টিলেটর-এর ব্যবস্থা আছে একমাত্র সেখানেই এই রোগীর চিকিৎসা হতে পারে। সাপকে চিনতে পারলে সময়মত সঠিক মনোভ্যারেন্ট অ্যান্টিভেনামের নির্দিষ্ট ডোজে চিকিৎসা করালে এবং প্রয়োজনে তাকে ভেন্টিলেটর যন্ত্রের সাপোর্টে রাখলে পৃথিবীর যে কোন সাপে কাটা রুগীকে গ্যারান্টি দিয়ে বাঁচানো যায়। আর সাপ চিনতে না পারলে পলিভ্যারেন্ট অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসা করতে হবে। আমরা দাবি করেছি শিলিগুড়ি এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ২টি বেড সাপে কাটা রুগীর চিকিৎসার জন্য রাখতে হবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভেন্টিলেটর-এর ব্যবস্থা নেই। সেখানে অবিলম্বে ভেন্টিলেটর যন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

বি. ম. – দেশে কোন্ রাজ্যে সাপের কামড়ে আক্রান্ত মানুষ বেশী?

রা. স. – দেশের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে সাপের কামড়ে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। পশ্চিমবঙ্গের স্থান এক্ষেত্রে ১০ নম্বরে। রাজ্যের মধ্যে বর্ধমান জেলার সাপে কাটা রোগী সবচেয়ে বেশী। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে মালদা জেলায় সাপে কাটা রোগী সবচেয়ে বেশী।

বি. ম. – আমরা হাসপাতালে বা হেলথ সেন্টারে সাপে কাটা রোগী নিয়ে গেলে চিকিৎসা না করে ফিরিয়ে দিলে কি করব?

রা. স. – হাসপাতাল সুপারিনটেন্ডেন্টকে জানাবেন। এই বিষয়ে সরকারী নির্দেশিকা আছে। আমি আপনাদের মেইল করে দেব। এছাড়া সরকারী সিদ্ধান্ত আছে রাজ্যে ৫টি জেলা – উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হুগলী, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে সাপের কামড় কমানো ও তার চিকিৎসার জন্য বিশেষ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ বঙ্গে তাই আপনারা ভাল কাজ করতে পারেন।

বি. ম. – সাপের কামড়ে মৃত্যু ঘটলে এর ক্ষতিপূরণ সরকারীভাবে কি পাওয়া যায়?

রা. স. – সরকারের ঘোষিত সিদ্ধান্ত আছে যে সাপের কামড়ে কেউ মারা গেলে মৃতের পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই বিষয়ে সার্কুলারটি আমি আপনাদের পাঠিয়ে দেব।

বি. ম. – পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি এক্ষেত্রে জরুরী?

রা. স. – না, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট জরুরী নয়। ডেথ সার্টিফিকেটে বিষাক্ত সাপের কামড়ের কথা লেখা থাকলেই হবে।

বি. ম. – বেশীরভাগ মানুষ তো সাপে কামড়ালে এখনও ওঝা, গুণিন, জানগুরু-র কাছে যায়। তাদের অনেক সময় বুঝিয়েও কাজ হয় না। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ?

রা. স. – ঠিক বলেছেন। মানুষ আমাদের বা ডাক্তার-হাসপাতালের চেয়ে ওঝাদেরই বেশী বিশ্বাস করে। সব সাপের কামড়ে তো আর মানুষ মারা যায় না। এখন অনেক ওঝারাও এই কথা জানে। তাদের মধ্যে অনেকে বিপদ বুঝলে বা নিজের লোক হলে হাসপাতালেই পাঠায়।

বি. ম. – শুধু বোঝালে তো কাজ হচ্ছে না। এক্ষেত্রে কি করণীয়?

রা. স. – আমাদের ওঝাদের সাথেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হবে। এটা ওদের পেশা। ওদের পেশায় আঘাত করে এখন কোন লাভ হবে না। আমরা উত্তর বাংলার অধিকাংশ ওঝাকে চিনি। ওদের বলি যে সাপে কামড়ালে বিপদ নেই সেগুলো তোমরা সামলাও আর যদি দেখ বিপদ বা যদি সন্দেহ হয় তবে সাথে সাথে আমায় খবর দাও আর হাসপাতালে পাঠাও। এই পদ্ধতি নেওয়ায় ভাল ফল পেয়েছি। অনেক ওঝাই আমায় খবর দেয় এবং হাসপাতালে পাঠায়। এর ফলে বহু মানুষকে বাঁচাতে পেরেছি।

বি. ম. – উত্তরবঙ্গের সর্বত্র হেল্‌থ সেন্টারে অ্যান্টিভেনাম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে? আমরা জেনেছি নকশালবাড়ি এলাকায় হেল্‌থ সেন্টারে অ্যান্টিভেনাম নেই।

রা. স. – সব হেল্‌থ সেন্টারে অ্যান্টিভেনাম নেই। আর থাকলেও সব জায়গায় এর চিকিৎসা সম্ভব নয়। ওই যে বললাম বেড থাকা দরকার, সাপোর্ট হিসাবে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা দরকার। তা তো সর্বত্রই নেই। আপনাদের ওখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবারে ভাল ব্যবস্থা আছে। সর্বত্র, অন্ততঃ মহকুমা ও সদর হাসপাতালে তা থাকার কথা। এর জন্য আমরা দাবী রাখছি।

বি. ম. – সাপ তাড়াতে কার্বোলিক অ্যাসিড কি কোনও ভূমিকা রাখে?

রা. স. – না, কার্বোলিক অ্যাসিড দিয়ে সাপ তাড়ানো যায় এই ধারণা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কোন কেমিক্যাল যা সাপের বিরক্তি বা ইরিটেশন তৈরী করে তা ব্যবহার করলে সেই এলাকায় সাপ তখনকার মত থাকে না। এক্ষেত্রে ব্লিচিং পাউডার কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারে।

বি. ম. – এতক্ষন সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা উত্তরবঙ্গে কোন অনুষ্ঠান করলে আপনার সহযোগিতা পাব এই আশা রাখি। রাত হয়ে গেছে তাই আর সাপ দেখানোর কথা বলছি না।

রা. স. – চেষ্টা করব। সকালে এলে অনেক সাপ দেখাতে পারতাম। তবুও চলুন কয়েকটা দেখাই।

[এরপর উনি উত্তর বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরা কিছু সাপ দেখালেন টর্চের আলো ফেলে। বাড়ির বাগানে বিভিন্ন খাঁচায় তারা নিশ্চিন্তে রয়েছে দেখে এলাম। পরবর্তীকারে রাজুবাবু গুরুত্বপূর্ণ চিঠি দুটি – ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত এবং সরকারী ক্ষেত্রে চিকিৎসা সংক্রান্ত, মেইল করে পাঠিয়ে দেন। স্থানাভাবে তা ছাপানো গেল না। কারও প্রয়োজন হলে সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করবেন।]

ডেঙ্গু নিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক'র সেমিনার

"ডেঙ্গু কি ও কেন?"

স্থান – পশ্চিম বড়িষা সরকারী আবাসন রিক্রিয়েশন ক্লাব, পোড়াঅশ্বত্থতলা, ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা

সময় – ২৫শে নভেম্বর, ২০১২ বিকাল ৪টে থেকে ৮টা।

কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা তার এলাকায় সেমিনার করতে চাইলে যোগাযোগ করুন।

রিপোর্ট

তরুণ ভারত ভাবনার আলোচনা সভা
বিষয়ঃ গ্লোবাল ওর্য়ামিং

১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১২তে মধ্য কোলকাতার প্রতাপ চন্দ্র চন্দর বাড়িতে দুপুর ৩টে থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়নের উপর একটি সভা। আয়োজক ছিল "তরুণ ভারত ভাবনা" নামক একটি সংগঠন। এটি কোনো সেমিনার নয়, বিভিন্ন সংগঠন এই সভায় আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিল। সভা শুরু হতে একটু দেরী হলেও তা শুরু হল উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে। তারপর এক এক করে বক্তারা তাঁদের বক্তব্য রাখলেন। প্রত্যেকেই বিশ্ব উষ্ণায়নে পুঁজিবাদী শিল্প বিকাশ ও সাধারণ জনগণের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপকে দায়ী করে তা নিয়ন্ত্রণে আনার দাবী রাখেন। এক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীকে দার্শনিক মডেল হিসাবে তাঁরা তুলে ধরেন। পরবর্ত্তী বক্তা ড. অসিত রায় যিনি কিনা একজন জিওলজিস্ট হিসাবে নিজের পরিচয় দেন, বলেন যে পুঁজিবাদ পৃথিবীতে আসার আগেও পৃথিবী উত্তপ্ত হয়েছে। তাকে বলে ন্যাচারাল গ্লোবাল ওয়ার্মিং। আবার তা ধীরে ধীরে ঠান্ডাও হয়েছে। মানুষ আসার আগে পৃথিবী প্রাকৃতিক নিয়মে এভাবে ৮বার গরম হয়েছে ও ঠান্ডা হয়েছে। শেষ এইরকম ঠান্ডা হবার ঘটনা ঘটে ১৮৫০ সালে যাকে 'মিনি আইস এজ' নামে আখ্যা দেওয়া যায়। এই অবধি বলে তিনি বলেন বর্তমানে যেভাবে পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে তাতে মানুষের কার্যকলাপ ও শিল্প বিকাশ অনেকাংশে দায়ী। এটিকে বলা হয় অ্যানথ্রোপজেনিক গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ যা কিনা মনুষ্যসৃষ্টি। এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। বিজ্ঞানমনস্ক থেকে অসিত রায়কে প্রশ্ন করা হয় যে তিনি যে বললেন ১৮৫০-এর শেষ মিনি আইস এজের কথা, তার মানে আমরা বর্তমানে ন্যাচারাল ওয়ার্মিং-এর পর্যায়ে আছি। মি. রায় নিজেই বলেছেন যে ন্যাচারাল ওয়ার্মিং-এর পর 'ন্যাচারাল কুলিং' হয়। তাই এই ওয়ার্মিং বা উষ্ণায়ন চিন্তার বিষয় নয়। কিন্তু পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন মনুষ্যসৃষ্ট কারণের কথা। তাহলে তিনি কি বলতে পারেন যে মনুষ্যসৃষ্ট ওয়ার্মিং ন্যাচারাল ওয়ার্মিং-এর তুলনায় কতগুণ বেশী? যদি তা ন্যাচারাল ওয়ার্মিং-এর সামান্য কিছু অংশ হয় তবে তো তাকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, কারণ তা স্বাভাবিক নিয়মেই ন্যাচারাল কুলিং-এর মধ্য দিয়ে ব্যালান্স করে যাবে। মি. রায় উঠে দাঁড়িয়ে জানান এবিষয়ে গবেষকদের এখনো পর্যন্ত সঠিক কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। তবে Inter Governmental Panel for Climate Change (IPCC)-র বিরোধী বিজ্ঞানীদের বক্তব্য অ্যানথ্রোপজেনিক ফ্যাক্টারটি নাকি নগণ্য। তাছাড়া অ্যানথ্রোপজেনিক ওয়ার্মিং-এর ফলাফলের পূর্বাভাষ করার জন্য IPCC-এর সেই সময়কার সভাপতি রাজেন্দ্র পাচৌরিকে নোবেল পাওয়ার পরও বহুভাবে সমালোচিত হতে হয়। বিজ্ঞান মনস্কর এই প্রশ্নের উত্তর দেবার পর মি. রায় আবার বক্তব্য রাখতে চান ১০ মিনিটের জন্য, সেখানে তিনি কার্বন বাণিজ্যের স্বরূপ উৎঘাটন করেন। তিনি দেখান যে মনুষ্যসৃষ্টি গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে কারণ করে কিভাবে পুঁজিপতিরা কার্বন বাণিজ্যে মেতে উঠেছে। অসিত রায়ের বক্তব্যপর আর দু-একজন বক্তব্য রাখেন। তারপরেই পূর্ব ঘোষিত বক্তা সজ্জনকুমার তাঁর বক্তব্য রাখেন নিতান্ত নিজস্ব ধারণার ভিত্তিতে। বিশ্ব উষ্ণায়ন যে হচ্ছে তা তিনি নিজের জীবদ্দশায় গাছপালা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই কেবল তুলে ধরেন। তিনি বক্তব্যে বলেন, ছোটবেলায় মানে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যেরকম বনস্পতি দেখা যেত আজ কাল নাকি তেমন আর দেখাই যায় না। তিনি বলেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর উপর তাত্ত্বিক আলোচনা না করে, কিভাবে এর ভয়ঙ্কর ফল থেকে মুক্তি পাব সে বিষয়ে কেউ বলছেনই না। তাঁর মত অনুযায়ী এই অ্যানথ্রোপজেনিক ওয়ার্মিং-এর কারণে পৃথিবী ধ্বংসের পথে চলবে যদি মানুষ সচেতন না হয়।

সভায় এবিষয়ে বিজ্ঞানমনস্ককে ১০ মিনিটের মধ্যে সংক্ষিপ্ত মতামত রাখতে বলা হয়। বিজ্ঞানমনস্ক বলে যে তাদের প্রতিটি ব্যাখ্যাই এবিষয়ে বাকী বক্তাদের থেকে আলাদা। বিজ্ঞানমনস্ক গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর বিষয়ে স্বতন্ত্র মত পোষণ করে এবং তা তারা তাদের পত্রিকা সমীক্ষণের মাধ্যমে প্রচার করে। সমীক্ষণের গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সংখ্যাটি উপস্থিত বেশীর ভাগ সংগঠনই কিনে নেয়। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কর এই সুনির্দিষ্ট মতামতের পরও আনুষ্ঠানিক ডেকোরাম মেনে আয়োজকরা ধরে নেন যে তাদের আলোছিত মতামতের সাথে নাকি বিজ্ঞানমনস্ক সহমত।■

‘প্রচার মাধ্যম ও সমাজ দায়বদ্ধতা’ সেমিনার কোন পথ দেখাতে পারল না

গত ১০ই নভেম্বর, ২০১২ বিবেকানন্দ মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে “সমকালিক” আয়োজিত আলোচনা সভার শিরোনাম ছিল– “প্রচার মাধ্যম ও সমাজ দায়বদ্ধতা”। সান্ধ্যকালিন সভাটি প্রবীনদের ভীড়ে ঠাসা। সঞ্চালক (শক্তি চট্টোপাধ্যায়) তাঁর বক্তব্যে আলোচ্য বিষয়বস্তুর মূল সুর ধরিয়ে দেন।

আমাদের দেশে সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমগুলি জন্মলগ্ন থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে লড়ে এসেছে। কালক্রমে পুঁজির নিয়ন্ত্রণ, প্রচার মাধ্যমকে ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাগুলি বদলে দেয় এবং মালিক শ্রেণীর কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। আর ভোগ্য পন্যগুলির পরিচয়ে সমাজের একজনের পরিচয় হয়ে ওঠে। অন্য দিকে ধর্মকে নিয়ে আসা হয় অর্থনৈতিক কারণকে ঢাকতে। তুমি বেকার কেন? দরিদ্র কেন? পূর্বজন্মের কর্মফলের কারণে। মোটকথা প্রচার মাধ্যমগুলি আমাদের কণ্ঠস্বর রোধ করে মনন-চিন্তন-বোধে একটা ভোগবাদী - অদৃষ্টবাদী সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিয়ে আমাদেরকে “পণ্যপ্রসাদী” করে তুলছে।

তাহলে সমাধানের পথ কি? জোড়ালো বিজ্ঞানসম্মত কোন পথ দেখাতে পারেনি। বরঞ্চ মাঝে মাঝে কিছু বিচ্ছিন্ন, দিশাহীন বক্তব্য উঠে এসেছে। যেমন-“ভারতের ২০০ কোটি মানুষ একই চটি পরে, জামা গায় দেয়, একই জিনিস খায়।” “পথ কি হবে বলা যায় না। এটা বড় কঠিন।” “একটা সিভিল সোসাইটি গড়ে ওঠা (দরকার)।” “বহুত্ববাদ (বহুত্ববাদী গণতন্ত্র) আসলে চরিত্রে নেই।”... ইত্যাদি। এভাবে গুলিয়ে দেওয়া কিছু কিছু বক্তব্য ও বিশ্লেষণ আসলে বার বার কশাঘাত করেছে সভার মূল সুরকে।■

বিজ্ঞান মনস্ক’র জন্য একটি কবিতা

– অমরেন্দ্রনাথ বৈদ্য

বিজ্ঞান মনস্কতা, বিজ্ঞান মনস্কতা
মানবের দূর্জয় মুক্তিদাতা।

জাগ্রত জীবনের জিজ্ঞাসা–
সন্ধানী মানুষের আকুলতা,
অন্তবিহীন পথযাত্রার –
রহস্য-রোমাঞ্চ প্রকাশ তা।

কার্য ও কারণের মধ্যে–
যুক্তির শৃঙ্খলা সৃষ্টি,
সুস্থ, সবল, সমৃদ্ধির-
দুর্বার গতিময় কৃষ্টি।

দূর করে যত প্রতিবন্ধকতা॥

মানুষের অতন্দ্র সাধনায়-
সভ্যতা হয় সমৃদ্ধ,
বিজ্ঞান চেতনার স্বপ্নে-
শত শত শতাব্দী ঋদ্ধ।

আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ-
বস্তুবাদী পথে চলবো।
এ সমাজ জঙ্গম করতে –
উল্লাসে এ কথাই বলবো।

বিজ্ঞান বিশ্বের পরম ত্রাতা॥

ঝাড়ফুঁক তুক্ তাক মন্ত্র-
তাবিজ, কবজ, আজ ভুলে যাও,
নিজের উপর রাখ আস্থা-
পাথর ধারণ করে কি যে পাও!

বাঁচবার একটাই রাস্তা-
বিশ্বের বিজ্ঞান রক্ষা,
যুগে যুগে জীবনের লুডোটায়-
পড়বেই তাহলে তো ছক্কা।

সকলের দাবী হোক এ মালা গাঁথা॥

[সমীক্ষণের দ্বিতীয় বর্ষ সংখ্যা - ৩-এ শ্রী অমরেন্দ্রনাথ বৈদ্য’র লেখা ‘বিজ্ঞান মনস্ক’র জন্য একটি কবিতা’টিতে সম্পাদকমন্ডলীর অমনোযোগ সঞ্জাত ভুলের কারণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লাইন বাদ পড়ে যায়। এই ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত হলেও অমার্জনীয়। কবিতাটির সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশের কথাকে মাথায় রেখে শ্রী বৈদ্যর কবিতাটিকে পত্রিকা পুনর্প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে – সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ]

শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও বিজ্ঞান (৫)

রোমান বিজ্ঞান

বিজ্ঞান গবেষণা ও বিকাশের ধারাবাহিক প্রবাহে প্রাচীন গ্রীক-বিজ্ঞান এক অন্যতম ফলক এবং বলা যায় আধুনিক বিজ্ঞানের বীজ প্রাচীন গ্রীক-বিজ্ঞান চিন্তাধারার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

গ্রীক সাম্রাজ্যের পতনের পরে ইয়োরোপে রাজনৈতিক প্রভূত্বের কেন্দ্র হয় রোম। গ্রীক-বিজ্ঞান তাত্ত্বিক গবেষণাধর্মী বিজ্ঞান ছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার পরিকাঠামো গ্রীসে গড়ে উঠেছিল। প্লেটোর বিদ্যাপীঠ, অ্যারিস্টটলের লাইসিয়ার্ম এমন দুটি বিখ্যাত কেন্দ্র। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমীদের স্থাপিত "মিউজিয়াম" পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাসক আনুকূল্যে গঠিত এই ধরণের পরিকাঠামো আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞান গবেষণা প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল।

প্রায় সাতশো বছর রাজনৈতিক প্রাধান্য ছিল রোমানদের। কিন্তু অদ্ভুত বৈপরীত্যে ছিল তাদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে। খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতাব্দী থেকেই দঃ ইতালী, সিসিলি ও দঃ ফ্রান্সের গ্রীক উপনিবেশগুলিতে দর্শন ও বিজ্ঞানের সমাদর ছিল। কিন্তু এই সংস্পর্শেও রোমানদের তত্ত্বীয়-বিজ্ঞানে কোনো আগ্রহ জন্মায়নি। বিজ্ঞানের যেটুকু প্রয়োগে শাসন, রাজ্যজয়, সৈন্যপরিচালনা ও দাস প্রথা পরিচালনা করা যেতে পারে সেই ব্যবহারিক বিজ্ঞানই রোমানরা সমর্থন করেছে। সিসেরো, ভার্জিল, ট্যাসিটাসের হাতে জন্ম নিয়ে ছিল রোমান সাহিত্য ও ইতিহাস, স্থাপত্য ও কলাশিল্পে প্রতিভা দেখিয়েছে রোমানরা, অথচ তত্ত্বীয় গবেষণামূলক বিজ্ঞানে রোমানরা আগ্রহী ছিল না। ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে সমস্ত আকর্ষণ থাকায় বলবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যায় তাদের তৎপরতা লক্ষ্যনীয় ছিল। জীববিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্রের তত্ত্বগত বিষয়ে মনোযোগী না হলেও, রোমানরা হাসপাতাল, সেবাকেন্দ্র স্থাপন, সামরিক বাহিনীর চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনায় এগিয়েছিল।

গ্রীকদের যুদ্ধে হারিয়ে রোমানরা গ্রীক সভ্যতাকে প্রাথমিক ভাবে গ্রহণ করে। এরপর তারা মনোযোগী হয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এবং ভাব ও চিন্তাভাবনা প্রকাশের উপযুক্ত নিজেদের ভাষা সৃষ্টি করতে। খ্রী. পূ. ১৫৪ থেকে ১৭৪– লুসিয়াসস্টিলো এবং ভারো, ডোনাটাস-এদের হাত ধরে জন্ম নেয় ল্যাটিন ব্যকরণ। প্রিসিয়ান ১৮টি খণ্ডে Institutions Grammaticae রচনা করেন। গ্রীক রচনাবলীর ছায়ায় সিসেরো, ভার্জিল, ট্যাসিটাস সাহিত্য ও ইতিহাস রচনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

যে সামাজিক দর্শন ও নীতিবোধের গর্ভথেকে সিসেরো, ভার্জিলদের মতো সংবেদনশীল রচয়িতারা জন্ম নিল, সেই সমাজে দাসদের উপর অত্যাচার কিন্তু অবর্ণনীয় ছিল। রোমান আমলে উগ্রদাস-প্রথা ফলিত-বিজ্ঞান গবেষণার বড়ো বাধা ছিল। কৃষি, বয়ন, রাস্তাঘাট বা নগর নির্মাণের মত শ্রমসাধ্য সমস্ত কাজই দাসদের উপর চাপিয়ে রোমানরা যন্ত্রশক্তির বিকাশের বিষয়টি উপলব্ধি করল না।

অনিবার্য বস্তুগত কারণে দাস-প্রথার উদ্ভব ঘটে। বিপুল এই শক্তির ব্যবহারে ব্যাবিলন, গ্রীক, রোমান সভ্যতা এবং তাদের অর্থনীতি বিকাশ লাভ করে, কারণ উৎপাদন ব্যবস্থা তখন মূলতঃ পেশীশক্তি নির্ভর ছিল। যুদ্ধবন্দি ও নিঃস্ব মানুষ হল দাস এবং দাস কেনা বেচার মধ্য দিয়ে জন্ম নিল ক্রীতদাস, ক্রমে ক্রীতদাস গণ্য হতে লাগলো "দ্রব্য" (Res) হিসাবে। জড় যন্ত্রের সাথে ক্রীতদাসদের কোনো পার্থক্য রোমান শাসকরা করেনি।

ক্যাটোর মত ক্রীতদাসছিল একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রমাত্র। On Duty গ্রন্থে ক্রীতদাসদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তিনি লিখেছেন। সিসেরো, পিস্তার, হোরেস প্রভৃতি নামকরা ব্যক্তিরা দুর্ভিক্ষের সময় ক্রীতদাসদের না খাওয়ানো, ঝড়ের সময় জাহাজ হালকা করতে ক্রীতদাসদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করা, রোমান যুবকদের জন্য ক্রীতদাসদের বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণের পরামর্শ দিতেন। এই সব চিন্তাভাবনা অবশ্যই নিছক ব্যক্তিগত ছিল না। তৎকালীন রোমান শাসকশ্রেণীরই এমন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

অথচ সংখ্যায় বিশাল (রোমান জন সংখ্যার প্রায় ৭৫%)এই ক্রীতদাসদের মধ্যে বুদ্ধিমান, বা শিক্ষিত মানুষ কি ছিল না? তাদের কেউ তো নিজেদের দুঃসহ ও হীন

জীবনযাত্রার কাহিনী বলে যায় নি! হতে পারে, অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন দাস-জীবনের ঔদাসিন্য ও নিরুৎসাহ এই অক্ষমতার কারণ।

সুপ্রসিদ্ধ রোমান কবি ও দার্শনিক লুক্রেটিয়াস গ্রীকদের এপিকিউরিয়ান দর্শন গ্রহণ করেছিলেন। এই দর্শন বাস্তববাদী দর্শন, অলৌকিকতা বর্জিত। এই দর্শনে পরমানুবাদ গুরুত্ব পেয়েছে। লুক্রেটিয়াস ডিমোক্রিটাসের চাপাপড়া আণবিকতত্ত্বকে প্রচার করেছেন। ডিমোক্রিটাস বলতেন, সত্য শুধু পরমাণু ও শূন্যতা। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল।

De rerum natura গ্রন্থে (এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত ৬টি খণ্ড) লুক্রেটিয়াস আণবিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন।অণু-পরমাণুর অনবরত সংঘর্ষ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ব্রহ্মাণ্ড অপরিবর্তনশীল ও অসীম। বস্তু ও শূন্যতা মিলে ব্রহ্মাণ্ড গঠিত। বস্তুর গতি অবিশ্রান্ত এবং অনবরত পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হয়। লুক্রেটিয়াসের মতে আত্মা ধারণাতীত অতিসূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা গঠিত। আত্মা সমগ্র দেহ পরিব্যাপ্ত করে থাকে, দেহকে বাদ দিয়ে আত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব।

এই আণবিক তত্ত্ব রাসায়নিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণদ্বারা অর্জিত নয় ঠিকই, কিন্তু না দেখা ছোটো কণিকার (পরমাণুর) বিষয়ে মানবিক ধারণা যে ক্রিয়াশীল ছিল, তা বোঝা যায়।

রোমানরা গাণিতিক গবেষণায় আগ্রহী ছিল না। এই সময়ে, রোমান আধিপত্যের যুগে, গ্রীকরাই গণিত ও জ্যোতিষের ধারাবাহিকতা রাখার চেষ্টা করেছে। সাধারণ গণনার কাজে রোমানরা আবাকাস পদ্ধতির ব্যবহার করতো। আবাকাসে একক, দশক, শতক প্রভৃতি অঙ্ক নির্দেশ করতে কতকগুলি সমান্তরাল সরলরেখার সারিতে নুড়ি জাতীয় ছোট ছোট বস্তু ব্যবহৃত হত। গণনায় ব্যবহৃত এই রকম নুড়ি বা পাথরের টুকরোকে Calculi বলা হত যা থেকে ভবিষ্যতে Calculation, Calculus প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব ঘটেছে।

জরিপের কাজে রোমানরা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের জ্যামিতি ব্যবহার করতো। পূর্তবিদ্যায় রোমানরা এগিয়ে ছিল, পরিমিতি ও জরিপের কাজের যন্ত্রপাতি তারা বানিয়েছিল। "গ্রোমা" ও "হোডোমিটার" এমনই দুটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্র।

গণিতে গ্রীক গবেষণার মূল বিষয় ছিল জ্যামিতি। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে গৃহনির্মাণ, নগর পরিকল্পনা, জরিপ এবং এইসব সংক্রান্ত মাপজোক সবই পরিমিতি ও জ্যামিতি কেন্দ্রিক। ক্রমে, নিকোমেকাস (খ্রী. অব্দ ১০০) ও ডায়োফ্যান্টাসের (খ্রী. অব্দ ৩য় শতক) সমসময়ে গ্রীক গাণিতিক গবেষণার ধারা পাটিগণিত ও সাংকেতিক গণিতের দিকে এগোল।

নিকোমেকাস লিখিত Introductio Arithmetica বইতে তিনি পাটিগণিতের আলোচনা করেছেন। সংখ্যা নিয়ে গবেষণা তাঁর বিশেষ অবদান। "ঘন সংখ্যারা (Cubical numbers) সর্বদাই পরপর অযুগ্ম সংখ্যার যোগফলের সমান"– এটি নিকোমেকাসের একটি প্রতিপাদ্য। তিনি আরোহ-প্রণালীর (Method of induction) সাহায্যে এই প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ডায়াফ্যান্টাস্ গ্রীক রোমান সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ। তিনি জ্যামিতিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সাংকেতিক ও গণনামূলক পদ্ধতিতে নানাপ্রকার সমীকরণ (Equation), অভেদ (Identity) প্রভৃতির সমাধান করেন। তবে, ঋণাত্মক রাশি সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। একে বীজগণিতের ভ্রূণাবস্থা বলা যেতে পারে।

প্যাপাস্ (আনুমানিক খ্রী. ৩য়-৪র্থ শতাব্দী) গ্রীক জ্যামিতিক প্রতিভার শেষ ব্যক্তিত্ব। Mathematical Collections তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্যাপাসের জ্যামিতি ও গণিত তৎকালীন গণিতজ্ঞদের পক্ষে দুর্বোধ্য ছিল, ফলে তাঁর প্রতিভা যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে নি। অনেক পরে আইজ্যাক নিউটন "প্যাপাসের সম্পাদ্য" পন্ডিতদের সামনে হাজির করেন যা আসলে শঙ্কুচ্ছেদ (Conic Section)-র সাধারণ সংজ্ঞা।

রোমান যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য মহিলা বিজ্ঞানী ছিলেন হাইপেসিয়া। তিনি অ্যাপোলোনিয়াসের কণিক জ্যামিতি ও ডায়োফ্যান্টাসের বীজগণিতের উপর সমালোচনামূলক রচনা প্রণয়ন করেন। বিধর্মী হাইপেসিয়ার কারণে খ্রীষ্টধর্ম বিপন্ন এই আওয়াজ প্রচার করে ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে একদল পাদ্রী তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করে।

বোয়েথিয়াস্ (৪৭৫-৫২৪ খ্রী.) একজন শ্রেষ্ঠ রোমান গণিতজ্ঞ। Institutis Arithmetica তাঁর শ্রেষ্ঠ গণিত-গ্রন্থ যা আসলে 'নিকোমেকাসের পাটিগণিতের ভাষান্তর। জ্যামিতির উপর লিখিত বোয়েথিয়াসের আর একটি বইয়ে ইউক্লিক-প্রস্তাবিত বহু জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য ও সম্পাদ্যের আলোচনা করা হয়েছে।

রোমানদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। কৃষিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার বিষয়ে রোমানদের সবিশেষ আগ্রহ ছিল, কারণ দুটিই প্রয়োগমূলক। ক্যাটো (খ্রী.পূ. ২৩৪-১৪৯), ভারো (খ্রী.পূ. ১১৬-২৭) কৃষিবিদ্যার উপর বই লেখেন।

প্লিনি (খ্রী. অব্দ ২৩-৭৯) Naturalis Historia (প্রকৃতির ইতিহাস) ৩৭ খণ্ডে রচনা করেন। এটি আসলে তাঁর একক প্রচেষ্টায় রচিত বিশ্বকোষ। এর অধিকাংশ বিষয়ই ছিল কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা বা সাধারণ ভাবে জীববিদ্যা। ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিসুভিয়াস্ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত পর্যবেক্ষণ করার সময় এই উৎসুক ও কর্মব্যস্ত জীবনের সমাধি ঘটে।

পেণ্ডানিওস্ ডিওস্কোরিকিস্ (খ্রী. প্রথম শতাব্দী) সামরিক বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন এবং তিনি উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণা করেন ভেষজ ও বনৌষধি নিয়ে গবেষণা করেন। উদ্ভিদের অঙ্গ সংস্থান (Morphology) সম্বন্ধেও তিনি বর্ণনা করেন। তিনি গ্রীক ভাষায় লিখতেন, পরে ল্যাটিন, আরবী ভাষায় তাঁর রচনা অনুদিত হয়।

গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রোমানরা উন্নত স্তরে নিয়ে আসে। ইউরোপে প্রথম হাসপাতাল ব্যবস্থার প্রচলন করে রোমানরা। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করে রোমানরা চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োগে যুগান্তর আনে।

সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেছি সংগঠিত কেন্দ্রগুলির উদ্ভব – শাসনকার্যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনায় যার পরিচয় আমরা পাই। অর্থাৎ জ্ঞান ও অর্জিত বিদ্যাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাই সংগঠিত ক্ষেত্রগুলির উদ্ভাবনের কারণ। রোমে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়মিত ভাবে শেখানোর জন্য অ্যাসলপিয়াকিস (খ্রী.পূ. ৪০-এ মৃত্যু) একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। রোমের সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় Schola medicorum নামে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র সচল ছিল।

সেলসাস্ খ্রী.অ. প্রথম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থকার। ল্যাটিন ভাষায় তাঁর রচিত সুবিশাল গ্রন্থটি হল De re medicai এই বইয়ে শল্য চিকিৎসার আলোচনা করা হয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ক্লডিয়াস গ্যালেন (১৩০-২০০) এক প্রধান স্তম্ভ বিশেষ। হিপোক্রেটিসের পরেই তাঁর স্থান। দীর্ঘ সময় ধরে (প্রায় দেড় হাজার বছর) গ্যালেনের চিকিৎসাবিজ্ঞান অপরিবর্তনীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে গেছে।

গ্যালেনের সময় মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল। তাই শারীর বৃত্তীয় গবেষণায় গ্যালেন অন্যান্য প্রাণীদেহ ব্যবহার করেন। তাঁর সৃষ্ট প্রভূত রচনার মধ্যে একশোটি গ্রন্থ সংরক্ষিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলিতে মানব সমতুল প্রাণীগঠন, শারীরস্থান (Anatomy) ও শারীরবৃত্তীয় গবেষণা লিপিবদ্ধ রয়েছে। শারীরস্থান সংক্রান্ত গবেষণায় গ্যালেন অস্থিতন্ত্র, মাংসপেশী, মস্তিষ্ক ও রক্তবাহী নাড়িগুলির বিবরণ, নার্ভ-সংক্রান্ত গবেষণা লিপিবদ্ধ করেন।

গ্যালেনের শারীরবৃত্তীয় গবেষণা প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব ও দর্শনের প্রভাবে পরিচালিত ছিল। স্টোইক দার্শনিকদের প্রচারিত natural spirit, vital spirit (যার দ্বারা নাকি জৈবধর্ম ও জীবনীশক্তি প্রকাশ পায়) মতবাদে গ্যালেন বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদ এবং শারীর বৃত্তের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সামঞ্জস্য রক্ষা করেই গ্যালেন শারীরবৃত্তীয় পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। প্রায় দেড় হাজার বছর পরে ইংরেজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভি (১৫৭৮-১৬৫৭) তাঁর রক্ত-সংবহন তত্ত্ব আবিষ্কার করে গ্যালেনের সমগ্র পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন এবং শারীর বৃত্তীয় ক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা নতুন ভিত্তি পায়।

আসলে এই হল বিজ্ঞানের – সীমাবদ্ধ জ্ঞান, ক্ষমতা ও সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীমাহীন আবিষ্কার ও চেতনার জন্ম দান। সিঁড়ির প্রতিটা ধাপ ক্রম ঊর্ধমুখী, কোনো কোনো ধাপে স্থায়িত্বের সময় হয়তো একটু দীর্ঘ, কিন্তু সেই দীর্ঘ স্থায়িত্বই গতির শেষ কথা নয়। আরো ধাপ উঠে এসেছে, উঠছে, বিকাশের এক গতিশীল অমরত্ব রচনা করে।

আমরা দেখেছি রোমান বিজ্ঞান গবেষণাধর্মী ছিল না; মূলত: প্রয়োগ ভিত্তিক ও সরাসরি জীবন জীবিকার জন্য বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করা হয়েছিল। পূর্তবিদ্যা,স্থাপত্য, জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থা রোমানদের এই ব্যবহারিক বিজ্ঞানচর্চার প্রমাণ দেয়। মূলত: সামরিক উদ্দেশ্যে রোমান সম্রাটরা বিজ্ঞান চর্চার উৎসাহ দিয়ে গেছেন এবং এই সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ভেঙে পড়ার সাথে সাথে ইউরোপের বিজ্ঞানের প্রাচীন যুগ শেষ হল। তারপর প্রায় একহাজার বছর ধরে ইউরোপের অন্ধকার যুগ শুরু হল (৪০০ খ্রী. থেকে ১৫০০ খ্রী.)। প্রচলিত ইতিহাসে, এই সময় হল মধ্যযুগ এবং তৎপরবর্তী সময়কে আধুনিক যুগ বলা হয়। ■

বিশেষ নিবন্ধ

ডেঙ্গু কী এবং কেন ?

বর্তমান বিশ্বে যে রোগগুলি নিয়ে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশী চিন্তিত ও আতঙ্কিত সেগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল ডেঙ্গু।

ডেঙ্গু কী ?

ডেঙ্গু হল মশাবাহিত, ভাইরাস ঘটিত একটি রোগ। তবে সব মশা এই ভাইরাসের বাহক নয়। এডিস গণের বিভিন্ন প্রজাতির (যেমন এডিস ইজিপটাই, এডিস অ্যালবোপিকটাস, এডিস পলিনেসিএকসিস ইত্যাদি) স্ত্রী মশা এই রোগ সংক্রমণে বাহকের কাজ করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রমাণিত হয় ডেঙ্গু একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। এর পূর্বে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিশ্চিত হওয়া যায় যে ডেঙ্গু ভাইরাস এডিস মশা দ্বারা বাহিত হয়। ডেঙ্গু ভাইরাস প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তনের পথে প্রাণীদেহকে আধার করে উৎপত্তি লাভ করেছে। এই ভাইরাস সংক্রামিত হওয়ার দুটি পরিষ্কার চক্র পাওয়া গেছে।

এই ভাইরাস মশার পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। এডিস ইজিপ্টাই যেমন জীবিত অবস্থায় ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক, তেমনি আবার এই মশার ডিমের মাধ্যমে ভাইরাস পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছাতে পারে।

অরণ্য অঞ্চলে ডেঙ্গু ভাইরাস বিভিন্ন প্রকার প্রাইমেট ও এডিস মশার মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এই চক্র এশিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকায় লক্ষ্য করা গেছে।

স্ত্রী এডিস মশার ডিমের পুষ্টির জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়। এডিস ইজিপ্টাই মানুষ তথা স্তন্যপায়ী প্রাণীদেহ থেকে নিঃসৃত কিছু রাসায়নিক পদার্থ যেমন অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাই অক্সাইড, ল্যাক্টিক অ্যাসিড, অকটেনল দ্বারা আকৃষ্ট হয়। কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গেছে এই মশা সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয় ডেক্সট্রোরোটেটারি অকটেনল দ্বারা। গবেষণায় আরও জানা গেছে জলে উপস্থিত কিছু ব্যাকটেরিয়ার দেহ নিঃসৃত রাসায়নিক

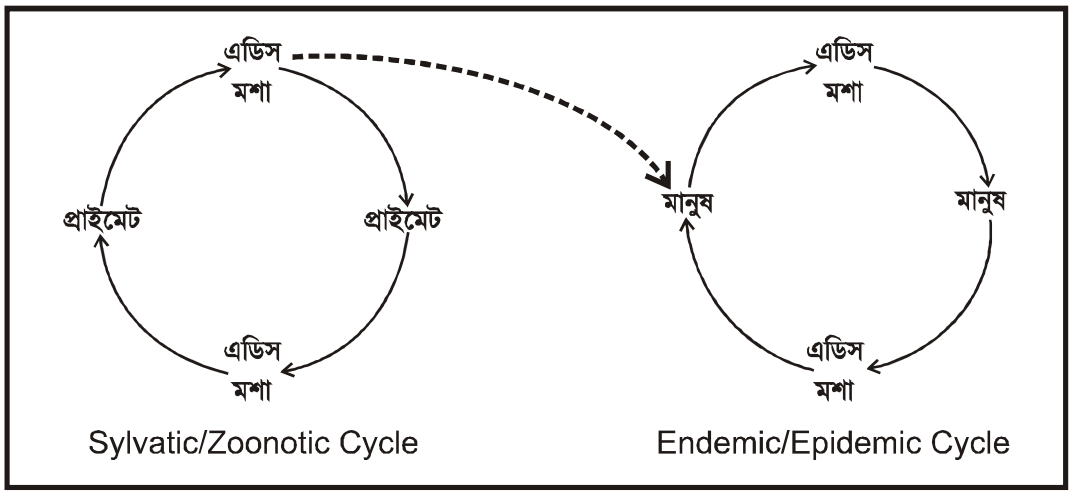

মানব সমাজে, বিশেষত শহরাঞ্চলে, স্ত্রী এডিস ইজিপ্টাই মশা ডেঙ্গু রোগগ্রস্ত কোনও ব্যক্তিকে দংশনের মাধ্যমে যে রক্ত গ্রহণ করে তাতে ডেঙ্গু ভাইরাস যুক্ত থাকায় ঐ ভাইরাস মশার শরীরে পৌঁছায় এবং ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যে মশার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সহ লালা গ্রন্থিতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পদার্থ স্ত্রী মশাকে জলে ডিম পাড়তে উৎসাহিত করে। এই কারণেই স্ত্রী এডিস ইজিপ্টাই মানুষের নিকটস্থ স্থির জলে ডিম পাড়ে। যদিও বিভিন্ন পরিবেশ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ এডিস ইজিপ্টাইয়ের আয়ুস্কাল ২-৪ সপ্তাহ, তথাপি এর ডিম এক বছর পর্যন্ত নতুন লার্ভা সৃষ্টি করার উপযুক্ত থাকে।

লিখিত ইতিহাসে ডেঙ্গু জ্বরের কথা উল্লেখ আছে ২৬৫-৪২০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে জীন রাজতন্ত্রের আমলে [Chinese Medical Encyclopedia from the Jin Dynasty (265-420 AD)]। তবে আপাতভাবে ডেঙ্গু মহামারী সম্পর্কিত বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় ১৭৭৯-১৭৮০-এর সময়কালে, যখন এশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আমেকিায় ডেঙ্গু মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। সেই সময় থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত মাঝে মধ্যে ডেঙ্গুর প্রভাব লক্ষ করা গেছে।

ডেঙ্গু শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনও ইতিহাস নেই। পূর্ব আফ্রিকার বহুল ব্যবহৃত বান্টু ভাষা'র Swahili phrase, "ka-dinga-pepo" থেকে এই শব্দের উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়, যার অর্থ শয়তান আত্মা দ্বারা সৃষ্ট রোগ। Swahili phrase-এর "dinga" সম্ভবত স্পেনীয় শব্দ "dengue" থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ হাড়ের ব্যাথায় চলন ভঙ্গিমা। ডেঙ্গু জ্বরের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, গা-হাত-পা ব্যাথা, মাথা যন্ত্রণা ও হাড়ের যন্ত্রণা। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডেঙ্গু মহামারীর পরে, ডাক্তার বেঞ্জামিন রাস এর নামকরণ করেন, "ব্রেক বোন ফিভার" – হাড় ভাঙ্গা জ্বর।

ভাইরাস সমন্বিত স্ত্রী এডিস ইজপ্টাইয়ের একটি দংশনই যেমন ডেঙ্গু সংক্রমণের জন্য যথেষ্ট, তেমনি আবার একটি স্ত্রী মশা পুষ্টি সাধনের প্রয়োজনীয় রক্ত গ্রহণ করতে অনেক ক্ষেত্রে বহু জনকে দংশন করে। ফলে একটি মশা দ্বারাই বহু মানুষের মধ্যে ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। স্ত্রী এডিস মশা দিনের বেলায়, প্রধানত সূর্যদ্বয়ের পরবর্তী দুঘন্টা এবং গোধূলির সময় দংশন করে।

ডেঙ্গু ভাইরাসযুক্ত, রক্ত গ্রহণ বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে ডেঙ্গু সংক্রামিত হতে পারে। সিঙ্গাপুরে প্রতি ১০০০ জনে ১.৬-৬ জন রক্তগ্রহণের মাধ্যমে ডেঙ্গু দ্বারা আক্রান্ত হন। গর্ভাবস্থায় বা জন্মের সময় মা এর শরীর থেকে ডেঙ্গু সদ্যোজাতর শরীরে সংক্রামিত হতে পারে।

ডেঙ্গু ভাইরাস

ডেঙ্গু ভাইরাস হল Flaviviridea শ্রেণীর RNA ভাইরাস। এই ভাইরাসের মিউটেশনের হার খুব বেশী হওয়ায় নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত মিউট্যান্ট এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই ভাইরাস প্রায় ১১০০০ নিউক্লিওটাইড ক্ষারক দ্বারা গঠিত যা তিন ধরনের প্রোটিন অণুতে পাওয়া যায়। আক্রান্ত পোষক কোষে এই ভাইরাস সাংকেতিক আকার ধারণ করে তিনটি স্ট্রাকচারাল এবং ৭টি নন-স্ট্রাকচারাল প্রোটিনে [NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5]। ডেঙ্গু ভাইরাসকে চারটি উপবংশে ভাগ করা হয়েছে যথা DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4।

ডেঙ্গু রোগের প্রকারভেদ

রোগ লক্ষণ ও রোগের ভয়াবহতা অনুযায়ী ডেঙ্গু রোগকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

১) সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষণ বিহীন জ্বর

২) সুনির্দিষ্ট ডেঙ্গু জ্বর (Dengue Fever/DF)

৩) ডেঙ্গু হেমারেজিক জ্বর (Dengue Haemorrhagic fever/DHF)

৪) ডেঙ্গু শক্ সিন্ড্রম (Dengue Shock Syndrom/DSS)

WHO ২০০৯ থেকে ডেঙ্গু জ্বরকে দুভাগে ভাগ করেছে, যথা সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর এবং মারাত্মক ডেঙ্গু জ্বর। ডব্লিউ এইচ ও'র মতে মারাত্মক ও ভয়াবহতার বিচারে ডেঙ্গু বিশ্বের ১৬তম রোগ। কিন্তু বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য সংস্থার বিচারে বর্তমানে মশাবাহিত রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়ার পরেই ডেঙ্গুর স্থান।

মানুষের শরীরে ডেঙ্গু ভাইরাস প্রবেশের পর রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে (ইনকিউবেশন পিরিয়ড) ৩ থেকে ১৪ দিন, গড়ে ৪ থেকে ৭ দিন সময় লাগে। এই সময় ভাইরাস নিজের পুষ্টি সাধন করে। ২-১০ দিনের মধ্যে তেমন কোন রোগ লক্ষণ চোখে পড়ে না। আক্রান্ত ব্যক্তির একটু জ্বর জ্বর ভাব লাগে। এই সময়কালে ভাইরাস পোষক দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বয়স ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলেও ৮০% ক্ষেত্রেই রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সুনির্দিষ্ট ডেঙ্গু জ্বরের তিনটি দশা – a) Febril b) Critical c) Recovery।

Febril দশায় দেহতাপ ১০৪° ফারেনহাইটের কম থাকে, গা-হাত-পা যন্ত্রণা, মাথার যন্ত্রণা প্রধানত চোখের পিছনের দিকে, বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, ৫০%-৮০% ক্ষেত্রে গায়ে লালাভ র‍্যাশ বের হয়। রক্ত জালক ফেটে অল্প থেকে মাঝারি পরিমাণ রক্ত চামড়ার নীচে জমা হয়। Critical দশায় মিউকাস মেমব্রেন ফেটে নাক-মুখ দিয়ে রক্তপাত হয়। এই দশায় জ্বর দুটি ধাপে দেখা যায়। প্রথম ধাপের জ্বর সম্পূর্ণ কমে যাওয়ার ২-১ দিন বাদে পুনরায় জ্বর আসে। Recovery দশা দীর্ঘায়ত হয় দুর্বলতা ও বিষণ্নতা সহ। সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা ফিরে পেতে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যায়।

DHFএর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ১০৪-১০৫° ফা. জ্বর। রক্তজালকের ভেদ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় রক্তরস রক্তবাহ থেকে

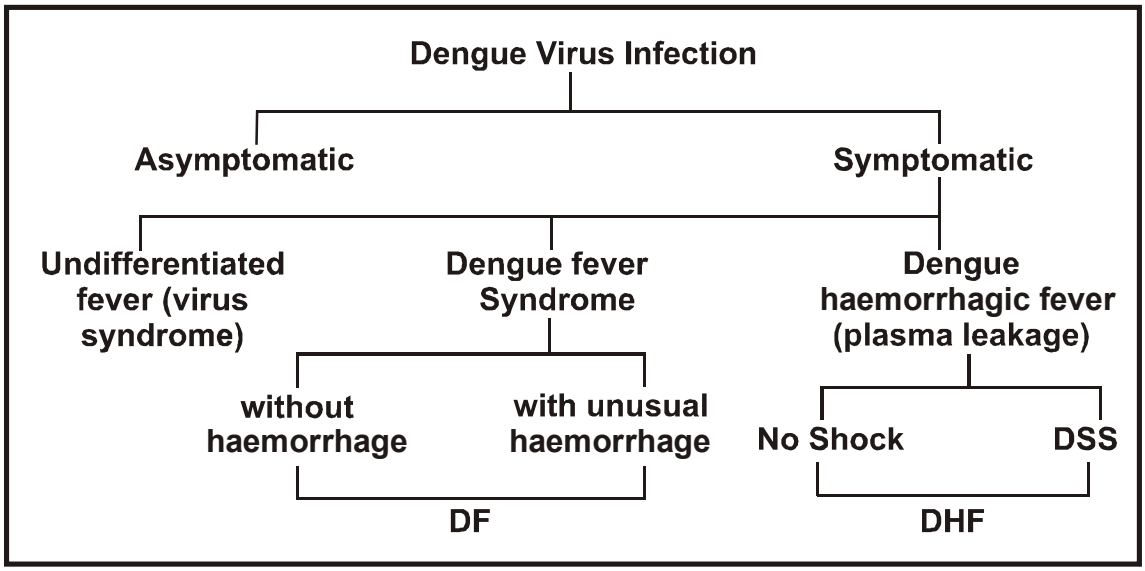

বের হয়ে এসে দেহ গহ্বরে জমা হয়। রক্তের তরল অংশ, রক্তবাহের মধ্যে হ্রাস পাওয়ায় রক্তের পরিবাহিতা হ্রাস পায়। ফলে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গতন্ত্রে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হয়। ঐ অঙ্গ-তন্ত্রগুলির কর্মদক্ষতা হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত কর্মে অক্ষম হয়ে পড়ে। DHF এ মারাত্মকভাবে রক্তপাত ঘটে। DSS হল DHF এর পরবর্তী অবস্থা। এই অবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী পেটের যন্ত্রণা, প্রায় অচেতন অবস্থায় থাকা, দেহ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে কমে যাওয়া – হল বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন অঙ্গ-তন্ত্র তার কর্মক্ষমতা হারায়। শেষ পর্যন্ত রোগী মারা যায়। যথাযথ চিকিৎসা হলে মৃত্যুর হার ১%এর কম হয়। কিন্তু DSSএর ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার প্রায় ৫০%।

DHF ও DSS সৃষ্টির কারণ

১) আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী

২) মিউটেশনের ফলে ভাইরাসের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা বৃদ্ধি

৩) পূর্বে ভিন্ন ধরণের DEN-ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়া

৪) বয়স, স্বাস্থ্য এবং বংশগত রোগের অস্তিত্ব।

দ্বিতীয়বার ভিন্ন ধরণের DEN-ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে DHF বা DSS হওয়ার কারণ সম্পর্কে দুটি মত আছে – ক) পূর্বে আক্রান্ত হওয়ায় সৃষ্ট অ্যান্টিবডি, পরে ভিন্ন ধরণের DEN-ভাইরাস-এর সঙ্গে ক্রস রিঅ্যাক্ট করে এবং অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স তৈরী করে যা শ্বেতরক্ত কণিকার কোষ পর্দায় আটকে যায়। কিন্তু উক্ত অ্যান্টিবডি ভিন্ন ধরণের হওয়ার ফলে ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হয় না। এই সুযোগে ভাইরাস শ্বেতরক্ত কণিকার মধ্যে প্রবেশ করে এবং দ্রুত বংশ বিস্তার করে ও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এন্ডোথেলিয়াল ও অনুচক্রিকা ধ্বংস হয়। এই ভাইরাস রক্ত জমাট বাঁধার যৌগকে আবদ্ধ করে। অনুচক্রিকা ধ্বংস এবং রক্তজমাট বাঁধার যৌগ, ফাইব্রিন, ভাইরাস দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় রক্ততঞ্চন ব্যাহত হয়। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ শুরু হয়।

খ) অন্য মতটি হল মিউটেশন হার উচ্চ হওয়ায়, ডেঙ্গু ভাইরাসের গঠনের পরিবর্তন এবং এদের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা প্রবল ও মারাত্মক।

তবে এখনো পর্যন্ত দেখা গেছে ডি এইচ এফ ও ডি এস এস-এর ঘটনা মোট আক্রান্তের ৫% থেকে কম। যদিও এই প্রকার ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডেঙ্গু জ্বরের মারাত্মক অবস্থা প্রথম রিপোর্টেড হয় ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপিন্সের ম্যানিলায়। ডি এইচ এফ ও ডি এস এস প্রথম নজরে আসে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট্রাল ও দক্ষিণ আমেরিকায়। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে এস বি হ্যালস্টেড প্রস্তাব করেন যে ডি এইচ এফ সেইসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাচ্ছে, যারা পূর্বে একবার অন্য ডেঙ্গু ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন।

গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গু রোগ হলে প্রাথমিকভাবে

বুঝতে পারা কঠিন, কেননা গর্ভবতী অবস্থার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য, ডেঙ্গুরোগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য-এর সঙ্গে মিলে যায়। গর্ভবতীদের ডেঙ্গু হলে, সদ্যোজাত সন্তানদেরও ডেঙ্গু হতে পারে এমন উদাহরণও আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা-এর শরীর থেকে শিশুর শরীরে ডেঙ্গু প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি পৌঁছে যায়। যদি মায়ের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরী এবং শিশুর শরীরে সেই অ্যান্টিবডি পৌঁছানোর সুযোগটুকু না পায় তবে শিশুর ক্ষেত্রে তা বিপদজনক। সদ্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রে প্রথম সংক্রমণেই ডি এইচ এফ-এর ঘটনা রিপোর্টেড হয়েছে। এর কারণ স্বরূপ বিশেষজ্ঞদের মত হল মা-এর শরীর থেকে সদ্যোজাতর শরীরে এক প্রকার IgG অ্যান্টিবডি সরবরাহ ও উপস্থিত থাকা এবং সদ্যোজাত ভিন্ন প্রকার ডেঙ্গু ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ডি এইচ এফ দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হওয়ার ঘটনা বিরল। ব্যাংকক (নিম্মান্নিতিয়া এট অল ১৯৯০)-এর এক শিশু হসপিটালে ১৬ বছর ধরে কেস স্টাডি করে দেখা গেছে দ্বিতীয় বার ডি এইচ এফ হওয়ার সম্ভাবনা ০.৫%। সাধারণভাবে শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই রোগ মারাত্মক রূপ নেয়। তবে বয়স নিরপেক্ষভাবে ডায়াবেটিস বা অ্যাসমার মতন রোগ থাকলে, ডেঙ্গু মারাত্মক আকার ধারণ করে।

ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুচক্রিকা হ্রাস পাওয়ার ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু এর কারণ কী? এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবগুলি হল –

i) Decreased Production

ii) Direct infection by virus

iii) Increase virus consumption

iv) Immune - Complex lysis

মানবদেহে ও পরীক্ষাগারে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে অনুচক্রিকার উপর ডেঙ্গু ভাইরাসের ক্ষতিকারক প্রভাব আছে। রোগীর শরীরে অনুচক্রিকার মধ্যে অল্প পরিমাণ ডেঙ্গু ভাইরাস ১৮ ঘন্টার মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণে পৌঁছাতে পারার ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, অনুচক্রিকার মধ্যে ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিলিপি গঠন করতে পারে। ডেঙ্গু ভাইরাস দ্বারা রোগীর অস্থিমজ্জা সরাসরি আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা গবেষণায় জানা গেছে। অস্থি মজ্জার মেগাকেরিওসাইটের সাইটোপ্লাজম হ্রাস পাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে, ডেঙ্গু ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির অস্থিমজ্জার বায়প্সি ক'রে। সব ধরণের ডেঙ্গু সংক্রমণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এরিথ্রয়েড কোষ হ্রাস পায় এবং অনেক সময় পরিণতও হয় না। কিন্তু যেহেতু লোহিত রক্ত কণিকার আর্ধায়ু তুলনামূলকভাবে বড় সেহেতু ডেঙ্গু রোগী দ্রুত রক্ত অল্পতায় আক্রান্ত হয় না।

ডি এইচ এফ ও ডি এস এস-এর ফলে মানবদেহে যে বিশেষ জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় সেগুলি হল –

i) Atypical neurologycal manifestation of dengue.

ii) Atypical gastrointestinal manifestation of dengue.

iii) Atypical renal manifestation of dengue.

iv) Atypical resperatory manifestation of dengue.

v) Atypical musculo-skeletal complication of dengue fever.

ডেঙ্গু রোগ নির্ণয়

প্রায় ৮০% ক্ষেত্রে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না, আবার বহুক্ষেত্রে রিপোর্টেড হয় না। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো টেস্টে এই রোগ না ধরা পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। যেখানে সহজে রক্ত পরীক্ষা করা সম্ভব নয় সেখানে ৫ মিনিট ধরে ব্লাড প্রেসার যন্ত্রের কাফ হাতে জড়িয়ে চাপ দিলে (Tourniquet test) যদি চামড়ার নীচে কোনও লালাভ রক্ত ক্ষরণের চিহ্ন ফুটে ওঠে তবে ডেঙ্গুর সম্ভাবনা থাকে। এর সংখ্যা যত বেশী হবে ডেঙ্গুর সম্ভাবনাও তত বেশী হবে। বহিঃলক্ষণ দেখে ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়াকে পৃথক করা কঠিন, কারণ উভয় ক্ষেত্রে বহিঃলক্ষণ প্রায় এক। প্রাথমিকভাবে রক্ত পরীক্ষায় শ্বেতরক্তকণিকা ও অনুচক্রিকার সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ঘটনা জানা যায়।

২ থেকে ৩ সপ্তাহের তফাতে দুটি ব্লাড টেস্ট দ্বারা ডেঙ্গু নির্ধারণ করা হয়, ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডির উপস্থিতি অনুযায়ী। ২০১১তে ইউ এস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডেঙ্গু নির্ধারনের জন্য একটি রক্ত পরীক্ষা অনুমোদন করেছে যা DEN-ভাইরাস Dect IgM Capture ELISA বা সংক্ষেপে ELISA (এলাইজা) পরীক্ষা নামে পরিচিত।

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটেছে এরূপ ব্যক্তির শবদেহ ব্যবচ্ছেদ ও পরীক্ষা করে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যে ঐ ব্যক্তি ডেঙ্গু রোগেই মারা গেছে। কারণ মারা যাবার অনেক আগেই ভাইরাস তার সংক্রমণ চক্র সম্পূর্ণ

করে ফেলে।

মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরি টেস্ট-এ ভাইরাসের উপস্থিতি ভাইরাল অ্যান্টিজেন ও নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি নির্ণয় করা সম্ভব। অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি নির্ণয় অপেক্ষা ভাইরাস ও নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের উপস্থিতি অনেক বেশী নিশ্চিতকর পরীক্ষা। কিন্তু এই নিশ্চিতকর পরীক্ষা ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় সর্বত্র সহজলভ্য নয়। ল্যাবরেটরিতে রোগ নির্ণয় নির্ভর করে ভাইরাস পৃথক করা এবং ঐ ভাইরাসের নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি নির্ণয় করার উপর। প্রতিটি পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আছে। প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ানের। ডেঙ্গু ভাইরাস সিরাম, প্লাজমা এবং শ্বেতরক্তকণিকা থেকে পৃথক করা যায়, রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে (৬ দিনের মধ্যে)। সেরোলজি ভিত্তিক পরীক্ষা সহজে করা গেলেও এটি জটিল হয়ে দাঁড়ায় পূর্বস্থিত অ্যান্টিবডির জন্য। IgM অ্যান্টিবডি, অসুস্থ হওয়ার ৩-৫ দিনের মধ্যে পাওয়া যায় ৫০% ক্ষেত্রে এবং ৫ দিন পরে পাওয়া যায় ৮০% ক্ষেত্রে। প্রথম সপ্তাহের শেষে IgG অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় অল্পমাত্রায় যা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং কয়েকমাস পর্যন্ত এর অস্তিত্ব থাকে।

ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা

ডেঙ্গু যেহেতু ভাইরাস ঘটিত রোগ, তাই এর কোনও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নাই। শারীরিক প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হয়। যদি জীবন সংশয় হয় তবে তৎক্ষণাৎ হসপিটালে ভর্তি করতে হবে। রোগীকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য ও আর এস-এর জলীয় দ্রবণ, 0.9% Saline Ringor's lacted, Hartmann's Solution ব্যবহার করতে হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে অন্তত ৬ ঘন্টা অন্তর রোগীকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি রোগীর জল পানের ইচ্ছা কমে যায়, যদি রক্তপাত শুরু হয়, যদি রক্ত পরীক্ষায় জানা যায় ডি এইচ এফ হয়েছে, অথবা যদি রোগী – শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী হন, তাঁর ডায়াবেটিস বা কোনও বংশগত রোগ থাকে, বা রোগীর ওজন খুব বেশী হয়, তবে দ্রুত হসপিটালে ভর্তি করতে হবে।

ডেঙ্গু রোগের সর্বব্যাপীতা

ডেঙ্গু – বহু পুরানো রোগ হলেও, তা প্রধানত গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা বর্তমানের ভয়াবহতার মতন এত প্রকট ছিল না। ইতিহাস থেকে লক্ষ্য করা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশে দেশে সেনাবাহীনির পদচারণা থেকে শুরু করে ডেঙ্গু রোগ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১১০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৬০ থেকে ২০১০-এর মধ্যে ৩০টি ধাপে এই রোগ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বিগত কয়েক বছর ধরে, প্রতি ৫-৬ মাস অন্তর, পৃথিবীর কোন না কোন দেশে ডেঙ্গু মহামারির খবর পাওয়া যাচ্ছে। ২০০২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরি'তে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ ডেঙ্গু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ২০০৮-এর ২০শে মার্চ রিও ডি জেনেরিও'র স্বাস্থ্য সচিব সের্গিও কোরটেস ৩ মাসের কম সময়ে ২৩,৫৫৫ জন ডেঙ্গু দ্বারা আক্রান্ত ও সরকারীভাবে ৩০ জনের মৃত্যুর সংবাদ উল্লেখ করে বলেন, "I am treating this is an epidemic because the number of cases is extremly high."। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রতি বছরে গড়ে ১০০ মিলিয়ন মানুষ ডেঙ্গু দ্বারা আক্রান্ত হন, যার মধ্যে ২,৫০,০০০ জন ডি এইচ এফ-এ ভোগেন এবং প্রায় ২৫০০০ জন মারা যান। ২০১১-এ বলিভিয়া, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, এল সালভাদোর, হন্ডুরাস, মেক্সিকো, পেরু, পুয়েরতোরিকো, ভেনেজুয়েলায় অসংখ্য মানুষ ডেঙ্গু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ২০০৭ থেকে প্যারাগুয়েতে ডেঙ্গু সংক্রমণের ঘটনা উদ্বেগজনক হয় এবং ২০১১ তে মহামারির আকার ধারণ করে। সেখানে হসপিটালগুলিতে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এতটাই বাড়তে থাকে যে, বাধ্য হয়ে পূর্ব নির্ধারিত ঐচ্ছিক অপারেশনগুলি বাতিল করা হয়। ইউ এস সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪৬ থেকে ১৯৮০-এর মধ্যে কন্টিনেন্টাল ইউনাইটেড স্টেটস-এ কোনও ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর নেই। ১৯৮০-এর থেকে অল্প অল্প করে ডেঙ্গুর খবর বাড়তে থাকে। সিডিসি'র মতে বিশ্ব জনসংখ্যার ৪০% ডেঙ্গু প্রবণ অঞ্চলে বসবাস করে। ইউরোপেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। হু-এর মতে প্রতি বছর ডেঙ্গু রোগে মারা যায় ২২,০০০ জন – যার মধ্যে বেশীরভাগই শিশু। হু-এর মতে, যদি ঠিক সময় ঠিক মত চিকিৎসা করা হয় তবে ডি এইচ এফ-এ মৃত্যুর সংখ্যা আক্রান্তের ২.৫%-এর মধ্যে থাকবে, না হলে মৃত্যুর সংখ্যা ২০% ছাড়িয়ে যাবে।

এ বছর এ রাজ্যে

এ বছর এ রাজ্যে সরকারীভাবে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা

Deugue fever outbreaks

Country	Region	Confirmed Cases Dengue (Year: 2010)	Suspected Cases (Year: 2010)	Reported Deaths (Year: 2010)	Compared with previous year	Figures as of**
World (sum of all regions)		1,785,059	N.A.	2,398		
Brazil	-	936,000	-	592	489,819	mid Oct
Colombia	-	121,600	-	161	-	Sep 24
Indonesia	-	-	N/A	N/A	155,000 and 1386 deaths	no date
Philippines	-	119,789	-	724	49,319 (up 140%)	Nov 17
Venezuela	-	124,931	-	-	65,869	all of 2010
Thailand	-	108,863	-	131	up 134.7% on sep 27	Nov 20
Vietnam	-	~80,000	-	59	105,370 (whole year)	Sep
Honduras	-	69,745	-	81	13,351 (whole year)	December 2010
Malaysia	-	45,037	-	133	39,537	dec 17
Sri Lanka	-	26,824	-	192		mid Jul
Costa Rica	-	21,000	-	N/A	3,326	end Aug
Laos	-	14,659	-	39	7,214(whole year)	aug 28
Puerto Rico	-	13,990	-	22	-	Sep 18
Paraguay	-	13,678	6138	n/a	n/a	sep 30
Mexico	-	12,240	-	20	15,032	week 32 (sep)
Indonesia	Bali	10,230	-	29	N/A	Jan-Oct
Dominican Republic	-	8,839	-	41	3,000	Sep 3
El Salvador	-	6,458	15,068	1	n/a	week 28
India	Delhi	5,837	-	8	1,153	Nov 9
Pakistan	-	7,000+	-	35	-	Nov 22

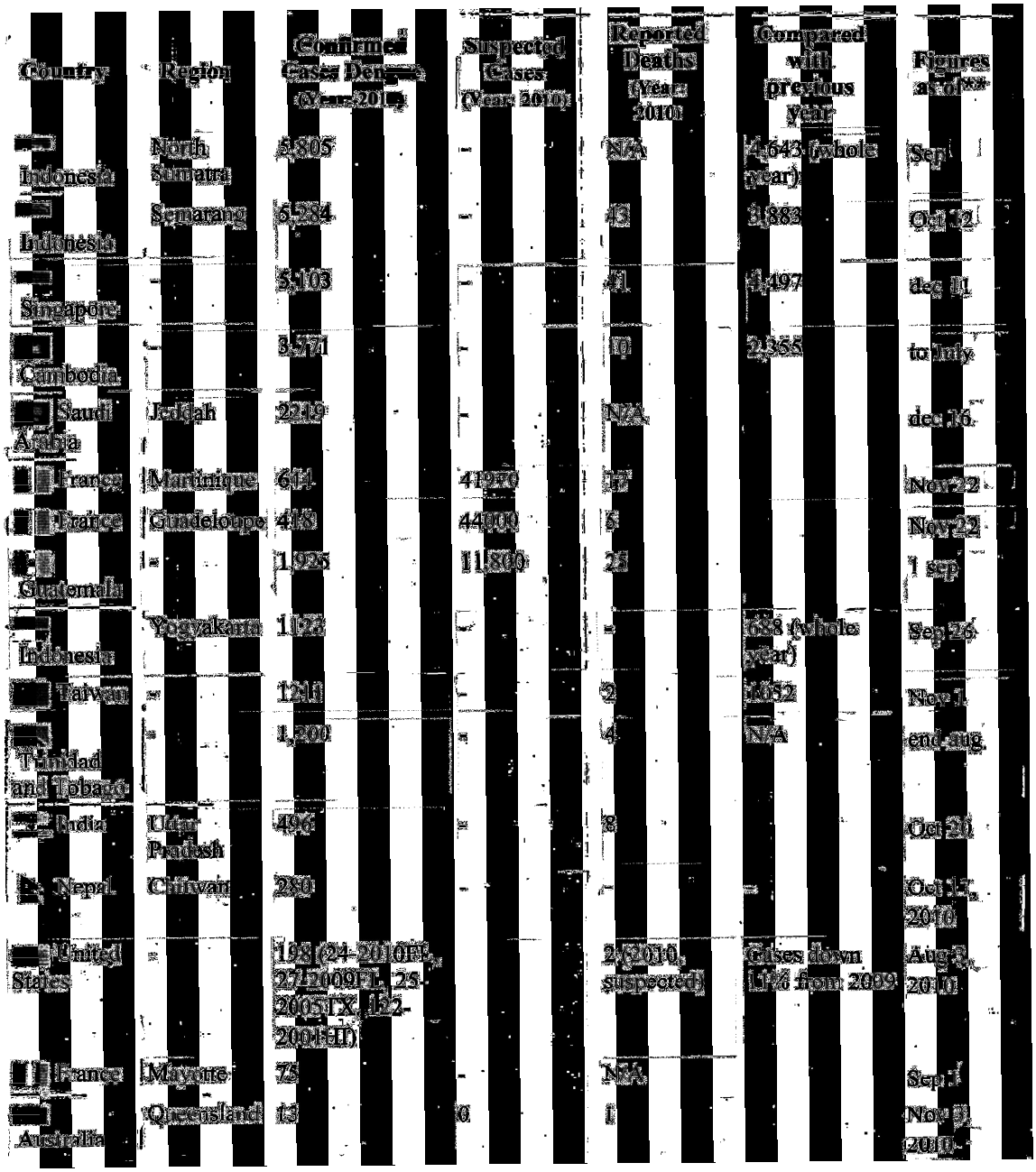

Country	Region	Confirmed Cases Dengue (Year: 2010)	Suspected Cases (Year: 2010)	Reported Deaths (Year: 2010)	Compared with previous year	Figures as of**
Indonesia	North Sumatra	5,805	-	N/A	4,643 (whole year)	Sep
Indonesia	Semarang	5,284	-	43	3,883	Oct 12
Singapore	-	5,103	-	41	4,497	dec 11
Cambodia	-	3,771	-	10	2,355	to July
Saudi Arabia	Jeddah	2219	-	N/A		dec 16
France	Martinique	644	41970	17		Nov 22
France	Guadeloupe	418	44000	5		Nov 22
Guatemala	-	1,925	11,800	25		1 sep
Indonesia	Yogyakarta	1123	-	-	688 (whole year)	Sep 26
Taiwan	-	1211	-	2	1052	Nov 1
Trinidad and Tobago	-	1,200	-	4	N/A	end aug
India	Uttar Pradesh	496	-	8		Oct 20
Nepal	Chitwan	280	-	-	-	Oct 17, 2010
United States	-	198 (24 2010FL, 27 2009FL, 25 2005TX, 122 2001HI)		2 (2010, suspected)	Cases down 11% from 2009	Aug 3, 2010
France	Mayotte	75	-	N/A		Sep 1
Australia	Queensland	13	0	1		Nov 3, 2010

কয়েকশ মাত্র এবং ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ১০এর কম। কিন্তু বেসরকারী তথ্য অনুসারে ডেঙ্গু দ্বারা আক্রান্তের সংখ্যা কয়েক হাজার এবং মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক।

এ বছর এ রাজ্যে ডেঙ্গু ঝড়ের দাপটে যে যে বিষয়গুলি সামনে উঠে এসেছে –

১) বেলেঘাটার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজ (নাইসেড)-এর গবেষকরা আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে, "ডেঙ্গু ৩" ভাইরাসের

অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।

২) ২০০৮-২০০৯-এ রাজ্যে যে ডেঙ্গু সংক্রমণ ঘটেছিল তা মূলতঃ ছিল DEN-1, DEN-2, DEN-4। ২০০৫-এ রাজ্যে DEN-3 ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেছিল।

৩) হুগলির মহসিন কলেজের শারীরবিদ্যার শিক্ষক শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় জানিয়েছেন রোগ জীবানুর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য শরীরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, কাজ না পেলে তা ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই ২০০৫-এর পরে ২০১২ এই দীর্ঘ সময় DEN-3 প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি কোনও কাজ না পাওয়ায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং এবার ডেঙ্গু সংক্রমণ ভয়াবহ হয়েছে।

৪) শুধু এবছর নয়, ২০০৫, ২০০৮, ২০০৯ -এ রাজ্যে ডেঙ্গু একবার কমে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল।

৫) রাইটার্স বিল্ডিং, রাজভবন, মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ, বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ – সর্বত্র এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেছে। বিভিন্ন হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা হস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছিল, পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়েছিল।

৬) কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নিয়মে জ্বরের পাঁচ দিনের মাথায় অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করতে হয়।

৭) ডেঙ্গু নির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা-বিতর্ক বিষয়ে বেসরকারী ক্লিনিকের এক চিকিৎসকের বক্তব্য – এলাইজা ও ক্রোমাটোগ্রাফি পরীক্ষায় রক্তের অ্যান্টিজেন ধরা পড়ে। ক্রোমাটোগ্রাফি পরীক্ষা সর্বজন স্বীকৃত। এলাইজা পরীক্ষায় অনেক সময় অ্যান্টিজেন ধরা পড়ে না। ... যদি ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতি অস্বীকৃত হয়, তাহলে পুরসভা শহরের সব ক্লিনিক ও বেসরকারী হাসপাতালে হানা দিয়ে ঐ যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করলেই সব সমস্যা মিটে যাবে।

৮) ডেঙ্গু নির্ণয়ে এন এস ওয়ান(NS1) পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার মেনে নেয় এবং ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে নাইসেডের মাধ্যমে প্রথম দফায় ৫ লক্ষ টাকার এন এস ওয়ান এলাইজা কিট কিনেছে রাজ্য সরকার।

৯) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডেঙ্গু ছড়ানোর জন্য প্রাকৃতিক কারণকেই দায়ী করেছেন। মূলতঃ বৃষ্টি হওয়া ও জল জমা। তবে মশা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আগামী ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

১০) ডেঙ্গু বিষয়ে একজন আইনজীবী জনস্বার্থে হাইকোর্টে মামলা করেছেন।

১১) সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের প্রায় ১০% এ রাজ্যে হওয়ায় নজরদারী ও রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থা জোরদার করতে বলেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

১২) রাজ্যপাল এম কে নারায়নন এর মন্তব্য – ডেঙ্গু মোকাবিলায় সরকারী তরফে দেরী হয়েছে।

১৩) স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর পতঙ্গবিদ্যা (এন্টেমোলজি) বিভাগটাই তুলে দেওয়া হয়েছে। জৈব-প্রযুক্তি বিভাগের সঙ্গে তা মিশে গেছে।

বিশ্বব্যাপী ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার কারণ

এডিস মশা দ্বারা ডেঙ্গু ভাইরাস বাহিত হলেও বিশ্বব্যাপী এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার জন্য আরো কতগুলি কারণ হল –

১) শহর বর্ধিত হওয়ার ফলে বনাঞ্চলের, এই ভাইরাসের সিলভ্যাটিক সাইকেল ভেঙ্গে এনডেমিক হিউম্যান সাইকেল সৃষ্টি করেছে।

২) চাকরি, ব্যবসা, ভ্রমণ, শিক্ষার জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত বৃদ্ধির ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন এক স্থান থেকে অন্যস্থানে জীবানু বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তেমনি ঐ যানবাহনগুলিতে মশাও বিনা টিকিটে স্থানান্তরিত হচ্ছে। সুতরাং রোগের জীবানু ও জীবানুর বাহক – দুই-ই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে দেশে দেশে সেনাবাহীনির পদচারনায় ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা হল ইতিহাস।

৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মশা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব ও দুর্বলতা।

৪) বিশ্বব্যাপী সাধারণের স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব।

৫) মশার বসবাস ও বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত স্থান বৃদ্ধি।

৬) সিলভ্যাটিক সাইকেল এর কোনও প্রাইমেট লোকালয়ে চলে এলে অথবা এই চক্রের মশা কোনও মানুষকে দংশন করলে, এই জীবানু ছড়িয়ে পড়ায় এনডেমিক হিউম্যান সাইকেল সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে ডেঙ্গু বিশ্বব্যাপী প্রধানত ৩০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক এডিস ইজিপটাই, প্রধানত অবস্থান করে ৩৫° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৩৫° দক্ষিণ অক্ষাংশে ১০০০ মিটার (৩৩০০ ফুট) উচ্চতা পর্যন্ত (২৭ পৃষ্ঠায় ছবি দেখুন)। সুতরাং মানুষের মধ্যে ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক, এডিস ইজিপটাই, যে প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান

করে, ডেঙ্গু প্রধানত সেই সব অঞ্চলেই ছড়িয়েছে। এছাড়া প্রকৃতিক পরিবেশ কোনও স্থিতিশীল বৈশিষ্টধারী নয়, বরং গতিশীল বৈশিষ্টধারী। ফলে পরিবেশের বিশেষত **জলবায়ুর এই গতিশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য সকল প্রাণীর ন্যায় এডিস ইজিপটাইও অভিযোজিত হয়ে চলেছে। এই অভিযোজন অনুযায়ী তার বসবাস ও বংশবৃদ্ধির যোগ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশিষ্ট ভৌগলিক সীমানা হ্রাস-বৃদ্ধি পায়।** পজিটিভ অভিযোজন বর্তমানে এই ভৌগোলিক সীমানা বৃদ্ধি করেছে। সম্প্রতি অস্ট্রেলীয়ায় এই বিষয়ে গবেষণার ফল এই বক্তব্যের অনুরূপ। Hales et al এর মতে পৃথিবী ব্যাপী ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন। উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় বৃষ্টির জমা অনাবৃত জলে বছরে এডিস মশার ৩০টি জীবন চক্র পূর্ণ হওয়ার ঘটনা যেমন পর্যবেক্ষণ করা গেছে, তেমনি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় একই শর্তে এডিস মশার মাত্র৬-১০টি জীবনচক্র পূর্ণ হতে লক্ষ্য করা গেছে। দেখা গেছে অগভীর, ছায়াপূর্ণ স্থির জল সকল প্রকার মশার বংশ বিস্তারের (ডিম→ লার্ভা→ পিউপা) উপযুক্ত।

আমাদের দেশের মতন দেশগুলিতে, শহরাঞ্চলে জল নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, অপরিকল্পিত। এই জলনিকাশি ব্যবস্থার নিয়মিত তদারকি করা হয় না। ফলে নর্দমা, খাল, কোথাও কোথাও সংশ্লিষ্ট নদীতে পলি পড়ে অগভীর প্রায় স্রোতহীন জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। এগুলিকে বলা চলে **মশা উৎপাদনের ফার্ম।** আবার শহরাঞ্চলে ব্যবহার যোগ্য যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় তা সংগ্রহ করে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা সকলের নাই, বিশেষত বস্তি অঞ্চল এবং নিম্ন আয়ের লোকেদের তো নাই। তাই তারা তাদের প্রয়োজনীয় জল বালতি, হাঁড়ি, কড়াই ইত্যাদিতে ধরে রাখে। এছাড়া ফুলদানি, টব, যে কোন গর্ত, ডাবের খোলা, যে কোন পরিত্যক্ত পাত্র – এগুলিতে জল জমে থাকলে তাও মশার বংশ বিস্তারের ক্ষেত্র স্বরূপ কাজ করে।

৫০ বছরের বেশী সময় ধরে ইউ এস সেনা ও সি আই এ যৌথভাবে জীবানুযুদ্ধের প্রধান লক্ষ্যরূপে ডেঙ্গু জ্বরের উপর গবেষণা চালিয়ে আসছে। ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে আমেরিকান সেনা ফোর্টডেট্রিক, সি আই এ-এর সঙ্গে পার্টনারশিপে মিলিতভাবে বহু মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে ডেঙ্গু জ্বর ও অচেনা রোগের গবেষণায় যাতে জীবানুযুদ্ধে ও ব্যবসায়িক কাজে তা আক্রমণাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা যায়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায়

ডেঙ্গু প্রতিরোধকারী কোনও ভ্যাকসিন এখনো পর্যন্ত বাজারে আসেনি। তবে ২০০৯ থেকে এখন পর্যন্ত একাধিক ভ্যাকসিনের পরীক্ষা চলছে। অনুমান করা হচ্ছে ২০১৫ নাগাদ বাজারে প্রথম ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে। ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসার জন্য অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণাও চলছে। ভাইরাসের প্রোটিনের গঠন কাঠামো জানতে পারায়, প্রয়োজনীয় ওষুধ আবিষ্কার-এর দিকে এগোনো সহজ হয়েছে। এ বিষয়ে আপাত সঠিক মনে হওয়া একটি পদক্ষেপ হল – ভাইরাসের প্রতিলিপি গঠন বন্ধ করে ভাইরাসের বংশ বিস্তার রোধ করা। কিন্তু **ভ্যাকসিনের বিষয়ে একটি মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হল একটি বিশেষ প্রকার অ্যান্টিবডি নির্ভর ভ্যাকসিন Severe ডেঙ্গুর ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।** [One of the concerns is that a vaccin could increase the risk of severe disease through antibody - dependent enhancement.]

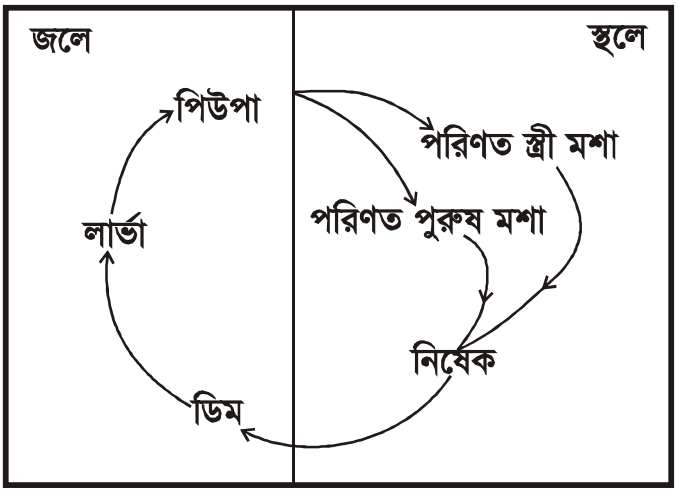

ডেঙ্গু ভাইরাসের সংক্রমণ যেহেতু এডিস মশার উপর নির্ভর করছে, সেই হেতু এডিস মশার ছড়িয়ে পড়া ও বংশবিস্তার রোধ করতে পারলে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

মশার জীবন চক্রের, ডিম→ লার্ভা→ পিউপা, দশাগুলি স্থির জলের মধ্যে ঘটে। সুতরাং স্রোত যুক্ত জলে মশার জীবন চক্র শুরুই হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে সরকারি জলনিকাশি ব্যবস্থা ও জলবন্টন ব্যবস্থা মশা উৎপাদন ও সংরক্ষণের 'অভয়ারণ্য' সৃষ্টি করেছে। আবার স্রোতহীন জলের উৎসগুলিতে পুকুর, ধান ক্ষেতে গাপ্পি (Guppy), তেলাপিয়া প্রভৃতি মাছ চাষ করলে ঐ মাছগুলি মশার ডিম, লার্ভা, পিউপা খেয়ে, মশা উৎপাদন কমিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এরও প্রয়োগ চোখে পড়ে না। নদী, খাল, নর্দমা নিয়মিত সংস্কার করলে, স্রোতহীন বৃহৎ জলাধারের অভাবে মশার ডিম–লার্ভা–পিউপা দশা পূর্ণ হতে পারে না, ফলে মশার সংখ্যা হ্রাস পায়। শহরাঞ্চলে নিয়মিত এবং গ্রামাঞ্চলে বর্ষার সময় বিশেষত চাষের সময় মশা মারার বিষ প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু সরকারীভাবে এর তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায় না। রোগ ছড়িয়ে পড়ার পরে কিছু কিছু লোক দেখানো পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এডিস ইজিপ্টাই

জিন প্রযুক্তি প্রয়োগে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা

পরীক্ষাগারে টেট্রাসাইক্লিনের উপস্থিতিতে এডিস ইজিপটাই মশার জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে যে নতুন মশা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের পুরুষ মশাগুলিকে বনে ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্য করা গেছে, এই পুরুষ মশাগুলি দ্বারা নিষেকের ফলে যে নতুন প্রজন্মের মশার সৃষ্টি হয়েছে তারা পূর্ণাঙ্গ মশায় পরিণত হতে পারে নি। ফলে এই প্রজন্মের মশার পক্ষে ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক হওয়া সম্ভব নয়।

অক্সফোর্ডের একটি ফার্ম, Oxitec, ব্রাজিলের Juazeiro-তে একটি রোগ প্রতিরোধক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন কতটা সক্রিয় তা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করে। এই রূপ মশাকে OX513A দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। অনুরূপ পরীক্ষা ২০১০-এ Coyman দ্বীপে করা হয়। এক্ষেত্রে ৩ মিলিয়নের বেশী পরিবর্তিত মশা ছেড়ে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়, দেখা গেছে মশার সংখ্যার ৮০% হ্রাস পেয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় একদল বিজ্ঞানির গবেষণায় জানা যায় যে এডিস ইজিপটাইয়ের শরীরে এক বিশেষ প্রকার ব্যাকটেরিয়া ঢুকলে মশার লালা গ্রন্থিতে ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রজনন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই ব্যাকটেরিয়ার জিন এডিস মশার মধ্যে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। ব্রাজিলের একটি সংস্থা এই জিনযুক্ত মশা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করেছে।

নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত, মেলবোর্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিন অফ সায়েন্স, স্টক ও'নিল এবং তাঁর সহযোগী গবেষকরা জানিয়েছেন যে স্ত্রী এডিস মশার দেহে, "ওলবাচিয়া" নামের একটি ব্যাকটিরিয়া বা তার জিন বর্তমান থাকলে মশার লালাগ্রন্থিতে ডেঙ্গু ভাইরাস বংশ বিস্তার করতে পারে না।

ডেঙ্গু সংক্রমণ এবং তা প্রতিরোধে জনসাধারণের সচেতনতা

সমাজের বহু সমস্যার জন্য সাধারণ মানুষের সচেতনতাকে দায়ী করা হয়। ডেঙ্গুর সংক্রমণের ক্ষেত্রেও সরকারী ও বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম জনসাধারণের সচেতনতার অভাবকেই প্রধানভাবে দায়ী করেছে। জল নিকাশী নর্দমা, খাল ইত্যাদিতে গৃহস্থালীর আবর্জনা এবং ব্যবহার অযোগ্য জিনিস পত্র ফেলায় অনেক সময়ই জল জমে থাকে। এছাড়া টব, ফুলদানি, চৌবাচ্চা ইত্যাদিতে জল জমে থাকে। আমরা জানি যে কোন স্থানে ১ সি.সি পরিষ্কার জল জমে থাকলেই সেখানে স্ত্রী এডিস মশা ডিম পাড়তে পারে। আবার সাধারণ মানুষকে দৈনন্দিন

গৃহস্থালীর প্রয়োজনে ঘটি, বাটি, হাড়ি, কলসি, বালতি, ড্রাম বা ট্যাঙ্কিতে জল জমা রাখতেই হয়। তবে কি বলব সচেতনতার অভাবে নিজেদের ঘর বাড়িতেই আমরা এডিস মশার আঁতুড়ঘর বানিয়ে রেখেছি?

একথা মেনে নিলে প্রশ্ন আসে যে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া দেশগুলির সর্বত্রই মানুষ কি একইরকম অসচেতন? গত শতাব্দীর ৭ এর দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে এডিস ইজিপ্টাই কে সরকারী প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ বিতাড়িত করায় সে দেশে ডেঙ্গু প্রায় আর হয়ই নি। শোনা যায় উন্নত দেশগুলিতে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ, জাপান ইত্যাদিতে মানুষকে সমাজ সচেতন করতে কঠোর আইনী ব্যবস্থা লাগু করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক বিধি নিষেধ না মানলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় একটি শিশু বা কিশোরকে মা-বাবা অতিরিক্ত শাসন করলে শিশু বা কিশোরটি যদি থানায় অভিযোগ জানায় তবে পুলিশ মা-বাবাকে শাস্তি দেয়, কেউ ট্রাফিক আইন ভাঙলে সরাসরি তাকে শাস্তি দেওয়া হয় ইত্যাদি। তবে কি এডিস মশা তৈরীর আঁতুড়ঘর বন্ধ করতে কোন দেশেই আইন বা বিধি নিষেধ নেই? **একমাত্র সাধারণ মানুষের অসচেতনার জন্য যদি এডিস মশা বিশ্ব জুড়ে লাগাতার মহামারী সৃষ্টি করে চলে তবে কোথাও তা বন্ধ করার জন্য কঠোর আইন বলবৎ নেই কেন? নাকি আইনী বিধি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কোথাও তা লাগু করা হয় না?** একথা ভুলে গেলে চলবে না যে প্রতিটি দেশের সরকারী আইনী বিধি নিষেধ নিজ নিজ দেশের সরকারের স্বার্থ যেমন রক্ষা করে তেমনই আবার কোন কোন আইনী বিধি নিষেধ লাগু না হলেই বরং সরকার তথা মালিকশ্রেণী লাভবান হয় । কারণ তা মালিকশ্রেণীর ব্যবসায়িক স্বার্থই সিদ্ধ করে। তাই আইন না থাকা বা থাকা সত্ত্বেও লাগু না হওয়া দুই-ই সমার্থক।

তাই দেশে দেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধে 'মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সচেতন নয়' বলে সব দায় সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে সমাজসচেতনতা বৃদ্ধির কাজে সরকারী দায় দায়িত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে। বর্তমান ব্যবস্থায় 'ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু অর্জন কর এবং সমাধান কর' এই শিক্ষা সামাজিকভাবে সমস্যা মোকাবিলা করতে শেখায় না, উল্টোটাই শেখায়। আর সমাজ সচেতনতামূলক সরকারী ও এন জি ও দের প্রচার মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে কোন কাজে আসে না। এতে "প্রচার ব্যবসার" স্বার্থ সিদ্ধ হয়।

আশঙ্কার বাস্তবতা

এ কথা সত্যি যে মশাবাহিত রোগ মশার অস্তিত্ব ও সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এ কথা সত্যি যে ১৯৭০ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর (মানুষ বসবাসকারী) বেশীর ভাগ অংশের জলবায়ু, প্রধানত তাপমাত্রা বছরের কোন না কোন সময় মশার বংশবৃদ্ধির অনুকূল। এ কথা সত্যি যে মানুষের বসতি অঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা সত্যি যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। একথা সত্যি যে দেশে-বিদেশে প্রায় সর্বত্র সরকারী অব্যবস্থা অগভীর স্রোতহীন জলাধারের সৃষ্টি করেছে – যা মশা উৎপাদনের ফার্ম। একথা, সত্যি যে প্রায় বিশ্বব্যাপী সাধারণের জন্য, "ফেল কড়ি মাখো তেল" স্বাস্থ্য নীতি বিদ্যমান।

কিন্তু **একথা মিথ্যা নয় যে বিভিন্ন দেশে মারাত্মক মারাত্মক জীবানু সংরক্ষণ করে রাখা আছে। একথা মিথ্যা নয় যে ঐ সংরক্ষিত জীবানুদের নিয়ে গবেষণা চলছে এবং ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিকভাবে এদের গঠন কাঠামো পরিবর্তন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। একথা মিথ্যা নয় যে এই সব জীবনুকে জীবানু অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে এবং হবে। একথা মিথ্যা নয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আজ অবধি বহুবার বহু দেশে এই পরিবর্তিত জীবানুদের মারণক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়েছে সাধারণের অজ্ঞাতে। এবং বহু মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, শষ্য শেষ হয়ে গেছে।**

জীবানু যুদ্ধে, rule of thum এর অর্থ হল শত্রুপক্ষকে মেরে ফেলার চেয়ে পঙ্গু করা শ্রেয়। কারণ অসুস্থ সৈন্যদের চিকিৎসা ও সেবা করা, কবর দেওয়া থেকে অনেক বেশী ব্যয় সাপেক্ষ। ১৯৭২ সালে, "দ্য বায়োলজিক্যাল ওয়েপন কনভেনশন" নামক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে জীবানু অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং এর কাঁচামাল মজুত রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার পরও ধারাবাহিকভাবে এর ব্যবহারের ইতিহাস রয়েছে। ২০০৯-এর গোড়ার দিকে চেক প্রজাতন্ত্রের কিছু সংবাদপত্রে, ভ্যাকসিনের মধ্য দিয়ে বার্ড-ফ্লু-এর জীবানু সরবরাহের প্রশ্ন উঠেছিল। আমেরিকার বক্সটার কোম্পানি ১৮টি রাষ্ট্রে ঐ ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছিল – এর উদ্দেশ্য ছিল দেশ ব্যাপী রোগ সৃষ্টি। আমাদের দেশেও "উড়ে এসে জুড়ে বসা" বার্ড-ফ্লু এর কথা প্রায় সকলেরই জানা আছে। "সোয়াইন ফ্লু"-এর সঙ্গে "ট্যামি ফ্লু"-এর সম্পর্ক কতটা বন্ধুত্বের! ১৯৯৪ সালে

পৃথিবী ব্যাপী ডেঙ্গুর বিস্তার

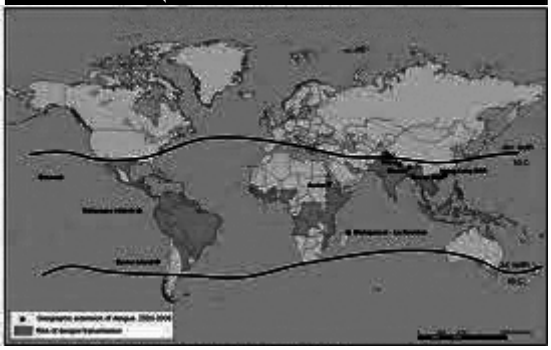

গুজরাটের সুরাটে হঠাৎ "নিউমোনিক প্লেগ"-এর আবির্ভাবের সঙ্গে আই ডি পি এল-এর 'টেট্রাসাইক্লিন'-এর সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ – তা কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন। সংরক্ষিত জীবানুগুলির সঙ্গে ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলির সম্পর্ক, এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

বিগত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পর্যায়ক্রমে ডেঙ্গু রোগের আবির্ভাব এবং ভয়াবহ আকার ধারণ করা থেকে ধারণা করা যতে পারে যে, জীবানু অস্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য দেশে দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপের সম্ভাবনা কম। কারণ, এখনও পর্যন্ত জীবানু অস্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য প্রায় বিশ্বব্যাপী ও ধারাবাহিক প্রয়োগ হয় নি, হতেও পারে না। কিন্তু এই জীবানুকে যদি এমনভাবে প্রয়োগ করা যায়, যাতে সারা বছর ধরে বিশ্বের কোথাও না কোথাও এই রোগ দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হবেই। ফলে এই রোগ ও রোগের বাহক সংশ্লিষ্ট কতকগুলি পণ্যের বাজার সারা বছরই বিশ্বের কোথাও না কোথাও চাঙ্গা থাকবেই। এই পণ্যগুলি হল –

ক) মশা তাড়ানোর ধূপ, কয়েল, স্প্রে, ক্রিম ইত্যাদি।

খ) General medicine। যেহেতু চিকিৎসা সিম্পটোম্যাটিক সেই হেতু সিম্পটম অনুযায়ী বিভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন ও ব্যবহার করা হয়। আবার যেহেতু ৮০% ডেঙ্গু অ্যাসিম্পটোম্যাটিক তাই সাধারণভাবে ভাইরাল ইনফেকশন মনে করে, অধিকাংশ ডাক্তার সেকেন্ডারি ইনফেকশন যাতে না হয় তার জন্য রোগীকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক-এর কোর্স করিয়ে নেয়। ফলে অ্যান্টিবায়োটিক-এর বিক্রিও ভাল হয়। সঙ্গে প্যারাসিটামল, ও আর এস, স্যালাইন বিক্রি তো হয়ই।

গ) ল্যাবরেটরি টেস্ট-এর বাজার চাঙ্গা হয়। আর এই চাঙ্গা বাজারের ভাগ পেতেই, রক্ত পরীক্ষা, কিট ও পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কে থমকে যায় সাময়িকভাবে।

ঘ) পরিকাঠামোর অপ্রতুলতায়, প্লাজমা, সিরাম, প্লেটলেটস্-এর চাহিদা দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্কট সৃষ্টি করে।

ঙ) ডেঙ্গু রোগ মহামারি সৃষ্টি করায় প্রাইভেট হাসপাতাল ও নার্সিহোমের ব্যবসা হয় চূড়ান্ত।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি বর্তমানে বিশ্বজুড়ে স্থায়ী মন্দার মধ্য দিয়ে চলছে। শিল্প ও কৃষিপণ্য উৎপাদনে চলছে অতিউৎপাদনের সংকট। এই অবস্থা সামাল দিতে বিশ্বের মালিকশ্রেণীকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। মন্দার যুগে বাজার সচল রাখতে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মত অসুখ মালিকশ্রেণীর হাতিয়ার হতে পারে। তাই **ডেঙ্গুর জীবাণুকে কৃত্রিমভাবে ছড়িয়ে দিলে মন্দা বাজার সচল হওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ যখন তার অনুকূল। ডেঙ্গুর ব্যাপকতা যেমন জেনারেল মেডিসিনের বাজারের প্রসার ঘটায় তেমনই ডেঙ্গু ভ্যাকসিনের চাহিদা সৃষ্টি করে।** এই সব সম্ভাবনার বাস্তবতা থাকলেও, তা সময়ের মধ্য দিয়ে সত্য বা মিথ্যায় পরিণত হবে।

হতে পারে, প্রাকৃতিকভাবে ডেঙ্গু ভাইরাসের মিউটেশনের হার খুব বেশী হওয়ার ফলে রোগের জটিলতা বাড়ছে। কিন্তু রোগের কারণ ডেঙ্গু ভাইরাস সরাসরি মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। প্রয়োজন হয় বাহকের। কিন্তু সেই বাহক এডিস ইজিপটাইকে নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থাই সর্বত্র বিদ্যামান। কারণ এই অব্যবস্থাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বার্থসিদ্ধি করে।

সুতরাং **প্রাকৃতিকভাবেই হোক বা ল্যাবরেটরির মাধ্যমেই হোক ডেঙ্গু রোগের ব্যাপকতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।**■

সাক্ষাৎকার

ডেঙ্গু কোন দিকে যাচ্ছে ?

প্রফেসর ডা. বিভূতি সাহা
বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কোলকাতা

[গত ৯ই নভেম্বর বিজ্ঞানমনস্ক'র পক্ষ থেকে **ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডা. বিভূতি সাহা'র** কাছে ডেঙ্গু প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়া হয়। আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া হয়। ডাক্তারবাবু প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যে ছিলেন। প্রথমে তিনি বলেন ১৫ মিনিট সময় দিতে পারবেন। পরে ৩০ মিনিট বললেও প্রায় ৪০ মিনিট তিনি আমাদের সাথে কথা বলেছেন। সময় এবং অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা আমাদের সব প্রশ্ন তাঁর কাছে রাখতে পারিনি। এ বিষয় আমাদের বহু প্রশ্ন অসমাধিত থেকে গেল। তবে অল্প সময়ের মধ্যে এবং এত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তার জন্য আমরা মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। আশা করি ভবিষ্যতেও তাঁকে আমরা আমাদের পাশে পাব। সম্পাদকমন্ডলী – সমীক্ষণ]

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ আমরা "বিজ্ঞান মনস্ক" থেকে এসেছি। আমাদের সংগঠনের একটা মুখপত্র আছে – "সমীক্ষণ"। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান, চর্চা ও সক্রিয় ভূমিকা এই পত্রিকার মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরি।

ডা. সাহা ঃ এই পত্রিকাটা কাদের জন্য? সাধারণ মানুষের জন্য?

বি. ম. ঃ হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের জন্য। আমাদের পত্রিকা কিন্তু বাংলায়।

ডা. সাহা ঃ সেটাই তো হওয়া উচিত।

বি. ম. ঃ এই সংখ্যায় আমরা ডেঙ্গু রোগ নিয়ে আলোকপাত করব। আমাদের অনেক কিছু জানা বোঝার আছে। আপনার সাথে আলোচনাটা "ইন্টারভিউ" আকারে রাখতে চাই। আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করেন।

ডা. সাহা ঃ ও. কে., আমরা কথা বলতে থাকি।

বি. ম. ঃ 'ডেঙ্গু' আমাদের রাজ্যসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০০৫, ২০০৮, ২০০৯ সালেও হয়েছিল। কিছু খবরের কাগজ – সংবাদ মাধ্যম একে ডেঙ্গি বলছে। শুরুতেই যেটা জানতে চাই – 'ডেঙ্গু' ও 'ডেঙ্গি' এই দুটোর মধ্যে কি কোন তফাৎ আছে?

ডা. সাহা ঃ তফাৎ কিছু নেই। উচ্চারণটাকে আপনি ডেঙ্গু করবেন না কি ডেঙ্গি, সেটা আপনার ব্যাপার, আমি ব্যক্তিগতভাবে তফাৎটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। ডেঙ্গু বললেও একই কথা হচ্ছে।

বি. ম. ঃ ডেঙ্গু রোগ সৃষ্টির কারণ কি? কিভাবে এই রোগটি হয়?

ডা. সাহা ঃ আরবো ভাইরাস (Arbo Virus) বলি আমরা। আরগো ভাইরাস মানে হচ্ছে যারা ইনসেক্ট (কীটপতঙ্গ) দিয়ে ট্রান্সমিটেড (সংবাহিত) হয়। মশা দিয়ে যেমন। এখানে ইজিপ্টাই প্রজাতির কিছু মশা আছে। একজন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে কামড়িয়ে মশা সেই ভাইরাসটা নিলো। মশার শরীরে

এটা সময় ধরে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তারপর সে মশা যখন অন্য একজনকে কামড়াচ্ছে – সাধারণত ৭ থেকে ১৪ দিন পরে – সে মশা তার শরীরে ভাইরাসটা ঢোকাচ্ছে। যার মধ্যে ঢোকাচ্ছে, তার রোগটা হবে কি হবে না নির্ভর করবে তার শারীরিক পরিস্থিতির ওপর।

বি. ম. ঃ ইমিউনিটি ওপর?

ডা. সাহা ঃ হ্যাঁ, ডেঙ্গু তো ৪টি প্রজাতির হয়। পরিভাষায় সেরোটাইপ (Serotype) বলি আমরা। ডেঙ্গু 1, 2, 3, 4 বলা হয়।

ধরুন আপনার ডেঙ্গু 1 হয়ে গেছে। একটা হয়ে যাওয়া মানে আপনি সারাজীবন সেই সেরোটাইপটার এগেইনস্টে ইমিউন হয়ে গেছেন। তাহলে আপনাকে যদি ভবিষ্যতে একটা ডেঙ্গু 1 বহনকারী মশা কামড়িয়ে, ডেঙ্গু 1 ভাইরাস ঢুকিয়ে দেয়, সে কিন্তু আপনার সিস্টেমে বসতে পারবে না অর্থাৎ ডেঙ্গু 1 হবে না। কারণ আপনি অলরেডি (ইতিমধ্যে) প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্থাৎ ডেঙ্গু 1 প্রতিরোধকারী এন্টিবডি তৈরি করে ফেলেছেন।

ভবিষ্যতে কখনো আর একটি মশা আপনার শরীরে ডেঙ্গু 3'র জীবাণু ঢোকাল। এবার যেটা হবে – কারো কারো ক্ষেত্রে, ডেঙ্গু 3'র সঙ্গে ডেঙ্গু 1টা (পূর্ববর্তী এন্টিবডি) মিশে একটা কমপ্লেক্স (জটিল বস্তু) তৈরি করে। আমাদের শরীরে কিছু প্রতিরোধী কোষ আছে। আমরা বলি ম্যাক্রোফাজ্(macrophage)। এই ম্যাক্রোফাজগুলো আপনার শরীরে তৈরী হওয়া কমপ্লেক্সটা খেয়ে নিলো। খেয়ে ওকে নষ্ট করতে না পারলে, উল্টে যেটা হল – ডেঙ্গু 3 ভীষণ সংখ্যায় বৃদ্ধি (enhanchement) করতে লাগল। আমরা বলি – এন্টিবডি ডিপেনডেন্ট এনহান্সমেন্ট (Antibody Dependent Enhanchment - ADE)।

তাহলে এবার আপনার ক্ষেত্রে রোগটা আরও বেশি হওয়ার একটা আশঙ্কা তৈরি হয়ে যায়। এভাবে ডেঙ্গুটা ছড়িয়ে পড়ে।

বি. ম. ঃ কিন্তু এই ঘটনার ২ বছর পরে আবার যদি আমাকে ডেঙ্গু 1'ই আক্রমণ করে, তাহলে কি আমার ...

ডা. সাহা ঃ ডেঙ্গু 1 কখনোই হবে না। অন্য ডেঙ্গু সেরোটাইপ দিয়ে আপনার হতে পারে। হলে সেইটা – এই দ্বিতীয় ইনফেকশনকে আমরা বলি, সেকেন্ডারি ইনফেকশন।

একদম ছোট বাচ্চা – ইনফ্যান্ট, যার মায়ের ধরুন ডেঙ্গু 2 আছে – বাচ্চা মায়ের থেকে জন্মগতভাবে ডেঙ্গু 2 এন্টিবডি পেয়ে যাবে। এবার ধরুন সেই ছোট্ট বাচ্চাটির জীবনে প্রথম ডেঙ্গু 3 রোগটি হল, সেটা কিন্তু তার ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি ডেঙ্গুর মত বিহেভ (আচরণ) করবে। কেননা তার মা'র থেকে অলরেডি ডেঙ্গু 2 অ্যান্টিবডি পেয়েছে। সেজন্য প্রাইমারি ইনফেকশন শিশুদের জন্য খুব সিরিয়াস (মারাত্মক) হতে পারে। কিন্তু এডাল্টদের ইউজুয়ালি (সাধারণত) সেকেন্ড ইনফেকশনটা সিরিয়াস হয়। বোঝাতে পেরেছি?

বি. ম. ঃ পরিষ্কারভাবে বুঝেছি। – আপনি বললেন যে, কারুর একটা ডেঙ্গু হয়েছে, ভাইরাস শরীরে রয়েছে। মশা তাকে কামড়ালো, এবং তারপর। মশা বাহক হয়ে গেল। কিন্তু প্রথম যে সংক্রমণটা, সেটা কিভাবে হচ্ছে?

ডা. সাহা ঃ ভাল প্রশ্ন। ডিম আগে না মুরগি আগের মত প্রশ্ন।

কিছু দেশে বাঁদর জাতীয় প্রাণীও ডেঙ্গু ভাইরাস বহন করে। আর একটা হচ্ছে – মশার মধ্যে ট্রান্স-ওভারিয়ান ট্রান্সমিশন। ডিমের মধ্যে ডেঙ্গুর ভাইরাসটা চলে যায়। সিস্টেমে থাকতে হবে তো।

সাধারণত ডেঙ্গুর প্রকোপটা বর্ষার সময়টাতে হয় এবং শীতটা খুব বেশি পড়া পর্যন্ত চলতে থাকে। সারা বছর ধরেই কিছু কিছু কেস হয়। বেশিরভাগটা এই সময়টা ধরে হয়। দেখবেন শীত যত বেশি পড়বে, আস্তে আস্তে কমে যাবে। বাকি সময়টা – বেশি শীত থেকে পরের বছর বর্ষা – এই সময়টা সে গেলো কোথায়?

কিছু কিছু কেস হতে থাকে। স্ট্রে কেস (খাপছাড়া)। আমরা এনডেমিক ডিজিজ (দেশগত, স্থানীয়) বলি। আর একটা হচ্ছে মশার মধ্যে ট্রান্স ওভারিয়ান ট্রান্সমিশন। ম্যালেরিয়ার কিন্তু ট্রান্স-ওভারিয়ান ট্রান্সমিশন হয় না। ম্যালেরিয়ার বাহক মশা কিন্তু তার সন্তানদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবানুটা দিতে পারে না। ফ্রেসলি অ্যাকোয়ার (নতুন ভাবে গ্রহণ) করতে হয়। কিন্তু ডেঙ্গুবাহী মা-মশা, জানেন তো মহিলা মশাটাই কামড়ায়, পুরুষ মশারা কিন্তু রক্ত খায় না। মশাদের মধ্যে রক্ত খায় কিন্তু মহিলারাই। কাজেই মা মশা তার ডিমের মধ্যে ডেঙ্গু ভাইরাসকে ট্রান্সফার করতে পারে এবং তার সন্তান সেখান থেকে ডেঙ্গু ভাইরাস পেতে পারে।

বি. ম. ঃ এই রোগের সাধারণ লক্ষণগুলো কি? মানুষ কিভাবে বুঝবে?

ডা. সাহা ঃ জ্বর, মাথাব্যাথা, হাত-পা ব্যাথা, চোখ নাড়ালে ব্যথা করছে, পিঠে ব্যথা – এগুলি প্রাথমিক লক্ষণ। তার সঙ্গে বমি হওয়া, কারো কারো পেট ব্যাথা হয় – এগুলো হচ্ছে কমন লক্ষণ। কিন্তু, এইবারের ডেঙ্গুতে প্রচুর ডাইরিয়া হয়েছে। আমি ঠকে গেছি। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় হয়েছে। জাস্ট পেসেন্টের ডাইরিয়া-জ্বর। আমি ভাবছি যে, কিছু একটা ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে। ডেঙ্গুর টেস্ট করে দেখি যে, ডেঙ্গু হয়েছে। আমরা শিখলাম। সারাজীবন তো মানুষ শেখে। যতদিন বাঁচে ততদিন শেখে।

বি. ম. ঃ কি ভেবে ডেঙ্গু টেস্ট করালেন? মানে মাথায় এলো কি করে?

ডা. সাহা ঃ যেহেতু ডেঙ্গুর আউটব্রেক (প্রাদুর্ভাব/মহামারী) চলছে তাই একটু বেশী কনশাস হয়ে গেছি।

আমি যেগুলো প্রথমে বললাম – জ্বর, মাথাব্যাথা, গা-হাত-পা ব্যথা, র‍্যাশ – প্রথম দিকে তিন চারদিনের মধ্যে একটা র‍্যাশ বেরোয়, ছ-সাতদিনের মধ্যে একটা ডিফারেন্ট টাইপের র‍্যাশ – এসব বলা আছে। ডাইরিয়া কিন্তু রুটিন সিম্পটমের মধ্যে নেই। জ্বর-গলাব্যথা-আমরা ভাবি, থ্রোট ইনফেকশন। অন্যসময় হলে তো ভাবতামই না।

বি. ম. ঃ ইতিহাস কি বলে – কতদিন ধরে মেডিক্যাল সায়েন্স এই রোগটাকে ডিটেক্ট করতে পেরেছে?

ডা. সাহা ঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস যদি বলেন – ভারতবর্ষে ডেঙ্গু কিন্তু বহুদিন ধরে হচ্ছে। কিন্তু এই যে বেশি সংখ্যায় হওয়া – ডেঙ্গু কমপ্লিকেশনস্-গুলো তো আমরা ভয় পাই।

আমাদের সবারই – আপনার, আমার হয়ত অনেকেরই ডেঙ্গু হয়েছে। আমরা ভাবিইনি কেউ। একটা জ্বর হল, একটু গা হাত-পা ব্যথা হল, আমরা ভাবছি যা একটু জ্বর হয়েছে – ভাইরাল কিছু হয়েছে – একটা প্যারাসিটামল খেলাম – দুদিন পরে চলে গেল। ডেঙ্গু টেস্ট করার প্রয়োজন পড়েনি। এটা কিন্তু সাধারণ ডেঙ্গু – ডেঙ্গুর অতি সাধারণ রূপ। এই সাধারণ ডেঙ্গু কিন্তু হচ্ছে – আনডিফারেনসিয়েটেড ইলনেস। আপনি তাকে আলাদা করতে পারছেন না বলে। ৯৫% এরও বেশি কেস এই রকম হয়। আউটব্রেক যখন হয়, তখন আমরা সচেতন হই। তখন ডায়াগনোসিস্ (রোগ নির্ণয়) বেশি হয়। ৫%-এরও কম ক্ষেত্রে কমপ্লিকেশন হয়। কমপ্লিকেশন মানে, এতদিন আমরা দুরকম দেখতাম। একটা হচ্ছে প্লেটলেট কমে যাওয়া থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া – যার জন্য রক্তপাত হয়। আর একটা হচ্ছে প্লাজমা লিকেজ, মানে রক্তরস রক্তনালী থেকে বাইরে চলে আসা – বুকে জল জমা (প্লুরা ইলফিউশন), পেটে জল জমা ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো আমরা জানতাম। বহুদিন ধরেই জানি।

এবছর আমরা তৃতীয়রকম একটা জিনিস দেখেছি। এটা আমরা খুব বেশি একটা জানতাম না – পড়েছি – নিজের চোখে বেশি দেখিনি। সেটা হচ্ছে, অরগান ড্যামেজ (অঙ্গের ক্ষতি) – সিভিয়র অর্গ্যান ড্যামেজ লিভার ড্যামেজ, কিডনি ড্যামেজ।

বি. ম. ঃ এটা কেন হয়? এর কারণ কি?

ডা. সাহা ঃ সম্ভবত নতুন সেরোটাইপ এখানে হয়েছে। এবার যে সেরোটাইপ হয়েছে – সম্ভবত নতুন সেরোটাইপ এসেছে। এগুলো নতুন আবিষ্কার নয়। আমাদের অঞ্চলে আগে দেখিনি। অন্য জায়গাতে হয়েছে। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া – এরা দেখেছে আগে। সিভিয়ার লিভার ড্যামেজ, সিভিয়ার কিডনি ড্যামেজ, হার্টের সমস্যা, আবার কারো কারো এনসেফালাইটিস – ব্রেইনের অ্যাফেকশন – এগুলো কিন্তু এবছর আমরা প্রথম দেখলাম। আগেও একটা আধটা করে দেখেছি, এবছর কিন্তু বেশি সংখ্যায় এগুলো দেখেছি।

এইটা হয়ত স্টেইন ভেরিয়েশনের জন্য হয়েছে। সিস্টেম যত ইভল্ভ করে, আমরা তখন নিজের সিস্টেমে মানিয়ে নিই। ওরাও তো চাইবে বেঁচে থাকতে। ওরা বাঁচবে না আমরা বাঁচব – এই একটা লড়াই চলছে। কাজেই সিভিয়ার অরগান ড্যামেজ কিন্তু এবছর আমরা অনেক বেশি দেখেছি, যা আগে কখনো দেখিনি।

বি. ম. ঃ ২০০৫ কিংবা ২০০৮-০৯'এ যখন ডেঙ্গু হয়েছিলো, তখন তাদের ব্যাপকতা তুলনামূলক বিচারে এবছরের চেয়ে কম না বেশি?

ডা. সাহা ঃ আমার প্রফেশনাল লাইফে এবছর যত ডেঙ্গু দেখেছি, আগে দেখিনি।

বি. ম. ঃ এবছরের ডেঙ্গুর মধ্যে বেশিরভাগ কি? যে 8 ধরনের টাইপ বললেন – ডেঙ্গু 1, 2, 3, 4।

ডা. সাহা ঃ এই সেরোটাইপিংটার একটা কনফ্লিকটিং রিপোর্ট (বিরোধী বিবরণ) আছে। এটা নিয়ে আমি মন্তব্য করব না। এই কারণে যে – দুটো ইন্সটিটিউট সেরোটাইপিং করেছে। দুটো দুরকম রিপোর্ট দিয়েছে। আমি নিজে ফিজিসিয়ান তো! কোন মন্তব্য করব না। বুঝতে পারছেন –

কেন?

আমি জানি, এবছর একটা ডিফারেন্ট সেরোটাইপ অবশ্যই হয়েছে, যার জন্য অন্য রকম কেস অনেক বেশি দেখছি আমরা। সেরোটাইপিং হয় ল্যাবোরেটরিতে। যেহেতু দুটো দল দুরকম করেছে, এটাতে আমি ঠিক ...। এটাতে আমার মতামত রিজার্ভ করছি। যেহেতু ওটা আমার নিজের কন্ট্রোলে না। পেসেন্ট আমি দেখি, পেসেন্ট কিরকম দেখছি সব আমি বলতে পারব; কিন্তু ...

বি. ম. ঃ ঠিক আছে। আচ্ছা, ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে ডেঙ্গুর কিরকম প্রকোপ?

ডা. সাহা ঃ সাউথ এশিয়ান দেশগুলিতে – ডেঙ্গু ইজ এ প্রবলেম। সাউথ এশিয়া আর সাউথ অ্যামেরিকা। হু-এর সিচুয়েশন আপডেট দেখলে বুঝতে পারবেন – ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু ডেঙ্গু বাড়ছে। ভারতবর্ষে ধরুন, এবছর তো ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায়, এখন তো দিল্লিতে হচ্ছে। এই দক্ষিণ থেকে এই দিকটা ঘুরে এবার উত্তরে গেছে। সারা পৃথিবীতেই কিন্তু ডেঙ্গু প্রচুর বেশি হচ্ছে, হু এটা কনসার্ন, কি করে এটা ...

সব বাড়ি-ঘর-দোর আমরা তৈরি করছি, ড্রেইন ঠিক করে করছি না, ব্রিডিং প্লেস অফ মসকুইটো অ্যালাউ করছি। আর হয়ত গ্লোবাল ওয়ামিং হচ্ছে, তাই টেমপারেচার বাড়ছে।

বি. ম. ঃ আপনি বলছেন যে এই বিশ্বজুড়ে যে একটা টেম্পারেচার এগজিস্ট করছে – সেটা ডেঙ্গুর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক?

ডা. সাহা ঃ দেখিয়েছে। যত টেম্পারেচার বাড়বে, তত মশা বাঁচে বেশিদিন এবং মশার মধ্যে ভাইরাসটা থাকে বেশিদিন। মশা ডেঙ্গু ভাইরাসকে মালটিপ্লাই করতে এলাউ করে এবং ভাইরাসকে ট্রান্সমিট করার ক্ষমতাও তার বেড়ে যায়। কাজেই এটাও কনট্রিবিউট নিশ্চই করছে।

বি. ম. ঃ স্যার, পরিযায়ী পাখির মাধ্যমে – ধরুন, এরকমও তো হতে পারে – পরিযায়ী পাখি যারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উড়ে যাচ্ছে, তাদের যদি মশা কামড়ায় – তাদের মাধ্যমে সংক্রামিত হতে পারে?

ডা. সাহা ঃ পাখিরা ডেঙ্গু ট্রান্সমিট করে না। মানকিস্ (বাঁদর) কিছু জায়গাতে পারে। পাখির মধ্য দিয়ে ট্রান্সমিট হয় – এরকম কোথাও বলা আছে বলে আমি জানি না। পাখির সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জার খুব সম্পর্ক আছে। পাখি যেখানে যায় – ট্রান্সমিট করে ইনফ্লুয়েঞ্জা। এই যে বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু – পাখি এবং শুয়োর, গবাদি পশু – এরা সব ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্রান্সমিট করে। কিন্তু ফরচুনেটলি (সৌভাগ্যবশত) পাখির সঙ্গে ডেঙ্গুর কোনও সম্পর্ক নেই।

বি. ম. ঃ ডেঙ্গুর কি টেস্ট?

ডা. সাহা ঃ টেস্ট মানে – ডায়াগনোসিস্ করার জন্য। কিছু হচ্ছে সাপোর্টিভ টেস্ট। এক্ষেত্রে দুটো জিনিস আমরা দেখি। একটা হচ্ছে রক্তে অনুচক্রিকা কমছে কিনা, আর রক্তের ঘনত্ব (হেমোকনসেনট্রেশন) বাড়ছে কিনা। প্যাক্ সেল ভলিউম বলে একটা কথা ইউজ করা হয়। প্যাক সেল ভলিউম মানে এক ইউনিট রক্তে কতটা প্যাক সেল আছে। যদি রক্তের জলীয় অংশ কমে যায়, রক্ত ঘন হয়ে যায়, ফ্লুইডিটি (তারল্য) কমে যায়, তাহলে বোঝা যায় – তার প্লাজমা লিকেজ করছে। এইটা দিয়ে আমরা ধারণা করি।

আর ডেঙ্গুর ডায়াগনোসিস যেমন – ৫ দিনের মধ্যে একটা টেস্ট, ৫ দিন পার করে আর একটা টেস্ট। ৫ দিনের মধ্যে ডেঙ্গু NS1 এন্টিজেন টেস্ট।

বি. ম. ঃ ফুল ফর্মটা কি স্যার?

ডা. সাহা ঃ নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন 1, এইটার জন্য দুরকম টেস্ট হয়। একটা হচ্ছে কীট টেস্ট, অন্যটা এলাইজা টেস্ট। এবছর ল্যাবরেটরিগুলো খুব ব্যবসা করেছে। দেখবেন এবছর ল্যাবরেটরিগুলো প্রচুর আর্ন (রোজগার) করেছে – ডাক্তারবাবুরা – আমার আপনার পকেট থেকে।

কীট টেস্টটার সেনসিটিভিটি কম, ৬০-৫০%। এলাইজা টেস্টটা কিন্তু ৯৫% সেনসিটিভ। কাজেই এলাইজা করতে পারলে আমি আরও নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে – হ্যাঁ ডেঙ্গু হয়েছে। ৫ দিনের মধ্যে যদি জানতে পারি ডেঙ্গু হয়েছে, তাহলে সুবিধাটা হচ্ছে যে, কমপ্লিকেশনগুলো সাধারণত ৫-৬ দিনের পর থেকে শুরু হয়। সাধারণত তার আগেই জানতে পারলে পেসেন্টকে সেভাবে চিকিৎসা করতে পারি। তাই এটা করতে পারলে ভাল। কিন্তু একটা খরচ রয়েছে এজন্য। পরের দিকে সরকারী হসপিটালেও এটা করা হয়েছে যদিও সময়মতো রিপোর্ট পাওয়া নিয়ে অনেক অভিযোগ আছে।

আর ৫ দিন পার করে হচ্ছে – এন্টিবডি দেখা। এই যে বলেছিলাম এন্টিবডি থাকে। যদি এন্টিবডি অ্যাপিয়ার করে কারো রক্তে – তাহলে ৫ দিন পরে আমি পরীক্ষা করে বলতে পারব যে, তার ডেঙ্গু হয়েছে। এভাবে ৫ দিনের মধ্যে NS1অ্যান্টিজেন এবং ৫ দিন পার করে এন্টিবডি টেস্ট করে

ডেঙ্গু রোগ নির্ণয় করা হয়।

বি. ম. ঃ মোটামুটি খরচ কিরকম হয় – এই নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটো কেসে?

ডা. সাহা ঃ NS1 অ্যান্টিজেন টেস্ট যদি আপনি করেন – বাজারে যেগুলো আছে ৮০০-৯০০ টাকা পড়ে যাবে। আর ওই অ্যান্টিবডির জন্য, ওরা তো কমন কিট ইউজ করে – এই ৮০০-৯০০ টাকা। কোথাও ১৪০০ টাকাও নেয়। গড়ে ৭০০-৮০০ টাকা।

বি. ম. ঃ আর একটা প্রশ্ন স্যার, এই সঙ্গে করব। ডেঙ্গুতে কেউ মারা গেল, তার পোস্টমর্টেম করা হল। এই পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কি – এই ভাইরাসের চিহ্ন – সে যে ডেঙ্গুতেই মারা গেছে – নিশ্চিত হওয়া যায়?

ডা. সাহা ঃ দুটো জিনিস আছে। আমাদের এখানে যে পোস্টমর্টেম হয়, আর যা হওয়া উচিত দুটো এক নয়। আগে আমাদের এখানে যা হয় বলি, আমাদের এখানে রোগের মধ্যে দেখা যায়, বিভিন্ন রকম হিস্ট্রি কি ছিল – জ্বর ছিল কিনা, র‍্যাশ-ট্যাশ হয়েছে কি হয়নি, বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তপাত হয়েছে কিনা এবং আপনি পোস্টমর্টেম করে দেখলেন যে, দেহের মধ্যে হেমারেজ হয়েছে, ব্রেনের মধ্যে হেমারেজ হয়েছে – আপনি মনে করলেন, সম্ভবত ডেঙ্গু হয়েছে, সম্ভবত। নিশ্চিত করতে হলে কিন্তু পি সি আর করতে হবে। ঐ টিসুর মধ্যে পি সি আর হল পলিমারের চেইন রিয়্যাকশন। পি সি আর মানে একটা ভাইরাস আছে কি নেই। তাহলে বডি টিসু নিয়ে যদি পি সি আর করে আমি দেখতে পারি – ডেঙ্গু ভাইরাসের অ্যান্টিজেন আছে, দ্যাট ইজ এ কনফার্মড টেস্ট। আরফরচুনেটলি (দুর্ভাগ্যবশতঃ) সেটা কিন্তু আমাদের এখানে হয় না।

বি. ম. ঃ ধরুন একজন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হল। ভাইরাস কি মরে যাবে?

ডা. সাহা ঃ ভাইরাস মরে যাবে একদম ঠিক কথা। অ্যান্টিজেন থেকে যাবে। ভাইরাসের প্রোটিনটা থেকে যাবে। এজন্য যদি তাড়াতাড়ি তার টিসুটা নিয়ে প্রিজার্ভ (সংরক্ষণ) করে রাখতে পারি – পরে যদি পি সি আর করি, তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পারব। রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে তা হয়, কিন্তু রুটিন কেয়ারের মধ্যে তা হয় না। আমাদের এখানে ধরুন যারা আনফরচুনেটলি মারা গেছে – আমাদের পরিকাঠামোতে কিন্তু তা কনফার্ম করার ততটা সুযোগ নেই। প্রোবাবেল আপনি বলতে পারেন, কনফার্ম করতে পি সি আর করতে হবে।

বি. ম. ঃ আচ্ছা নির্ণয় তো হল। এখন চিকিৎসার ক্ষেত্রে কি উপায়? মানে চিকিৎসা তো দু'রকম – একটা প্রিভেনটিভ, আর একটা কিউরেটিভ।

ডা. সাহা ঃ মূলতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হচ্ছে জল এবং প্যারাসিটামল। বিভিন্ন ডাক্তারবাবু অকারণে নানা রকম হাই স্ট্রেংথ ব্যথার ওষুধ ইউজ করছেন। প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনও ওষুধ জ্বরের কারণে খাওয়া যাবে না। এন্টিবায়োটিক, ডেঙ্গু সিওর হলে দরকার নেই। ডেঙ্গু ছাড়া অন্য কিছু সঙ্গে থাকলে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে। আর কমপ্লিকেশন যে বললাম, প্লেটলেট যদি কারো ডেনজারাসলি (ভয়ংকরভাবে) কমে যায়, অধিকাংশেরই কিন্তু সেই ডেনজারাসলি কমে না। প্লেটলেট দেওয়ার ক্ষেত্রে ভীষণ মিসইউজ হয়। ৬০,০০০ প্লেটলেট কাউন্ট অথচ প্লেটলেট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের হাসপাতালে এবার ১০,০০০ অবধি কাউন্ট অবসারভ করেছি – কিচ্ছু দিই নি; জাস্ট সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিয়েছি।

প্লেটলেট দেওয়ার প্রয়োজন হয় খুব কম ক্ষেত্রেই – যাদের রক্তপাত হয়েছে বা অনুচক্রিকার সংখ্যা খুব কমে গেছে – তাদের প্লেটলেট দিতে হয়; বাকিদের দরকার পড়ে না। কারো কারো খুব বিশ্রীভাবে হেমারেজ হয় – রক্তপাত হয়। আমরা একটা টার্ম ইউজ করি – ডি আই সি। এক্ষেত্রে প্লাজমা দিতে হয়, রক্তরস। আর যদি কারো অরগান ড্যামেজ হয়ে যায় – সিভিয়ার লিভার ড্যামেজ, সিভিয়ার কিডনি ড্যামেজ হয় তাকে অর্গান সাপোর্ট দিতে হবে। কাজেই ঠিকঠাক করে যদি ম্যানেজ করা হয়, মৃত্যু ২% এর বেশি হওয়া উচিত নয়। ম্যাক্সিমাম এলাউড ১ থেকে ২%; সিভিয়ার কেসগুলোর মানে খারাপগুলোর মধ্যেও।

বি. ম. ঃ এবার যেটা জানতে চাই – ডেঙ্গু মশাবাহিত রোগ – সেটা আপনি বললেন। তা ডেঙ্গুকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবস্থা নিলে সেটা সায়েন্টিফিক হবে – মশা নিয়ন্ত্রণ, নাকি ব্যক্তিগত চিকিৎসা – কোনটা সায়েন্টিফিক?

ডা. সাহা ঃ প্রিভেনশন দুটো। একটা হচ্ছে প্রিভেনশন অফ ট্রান্সমিশন – আপনার মধ্যে রোগটা যাতে আসতে না পারে। আর একটা হল – প্রিভেনশন অফ এটাক বাই এ সিঙ্গল পারসন।

মশা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অনেক কিছু বলি-টলি। কাজের কাজ এমন কিছু করি না। একটা কম্বাইন্‌ড এফর্ট লাগে। বিভিন্ন বিভাগ – জনস্বাস্থ্য, কারিগরি বিভাগ – ইঞ্জিনিয়ারিং যে

ডিপার্টমেন্টগুলো রয়েছে, মিউনিসিপালিটি করপোরেশন – সবার উপরে কিন্তু মানুষের সচেতনতা। আমি আর আপনি, আমরা খুব বড় বড় কথা এখানে বসে বলছি – দেখবেন আমরা বাড়িতে এমন কিছু করে রেখেছি, যেখানে মশা ডিম পাড়ছে। আমি নিজে যেটা মনে করি – আমাদের পাবলিক অ্যাওয়েরনেশটা খুব বাড়ানো দরকার – যে আমরা জল কোথাও জমতে দেব না। এক ঘন সেন্টিমিটার জল পেলে ডেঙ্গুর মশা ডিম পেড়ে দেবে। কাজেই আমরা কোথাও জল জমতে দেব না; যেখানে জল জমাতেই হবে – ৭ দিনের মধ্যেই জায়গাটা চেঞ্জ করব, ঘষে-মেজে পরিষ্কার করব। ব্যস্ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল একটিভিটিস।

আউটব্রেকের সময় সম্ভব হলে বাচ্চাদের একটু ফুল স্লিভের জামা-কাপড় পরাবো। মসকিউটো ক্রীম লাগাবো। দিনের বেলায় কামড়ায়, রাতে তো কামড়ায় না। বাচ্চা স্কুল যাচ্ছে – কামড় খাচ্ছে – নিয়ে চলে আসছে, আপনি অফিসে যাচ্ছেন – কামড় খাচ্ছেন – নিয়ে চলে আসছেন। গরমের সময় তো ঘুরছেন – যতটা সম্ভব ফুল-স্লিভ পরা, মসকিউটো রিপেল্যান্ট ইউজ করা – ইনডিভিজুয়াল প্রোটেকশন।

বি. ম. ঃ ভ্যাকসিন ?

ডা. সাহা ঃ ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ চলছে। এই ৪টি রকম ডেঙ্গুর এগেইনস্টে ভ্যাকসিন তৈরি করে সেটা প্রয়োগ করা হয়েছে। বাচ্চাদের পপুলেশনের রেজাল্ট – অ্যারাউন্ড ৬০%-এর মত সাকসেস। এডাল্ট ট্রায়াল চলছে। কিন্তু তাহলেও সেন্ট পারসেন্ট কোন ভ্যাকসিন হয় না। একমাত্র স্মল পক্স ভ্যাকসিন ১০০% সাকসেস হয়েছে। ডেঙ্গু ভ্যাকসিন অত সাকসেসফুল নয়। বাচ্চাদের ৬০% বলছে। এডাল্টদের খুব বেশি তার থেকে ক্রস করবে না। কাজেই আপনাকে হয়ত ৬০% প্রোটেক্ট করছে। বাকি ৪০%?

বি. ম. ঃ মশা নিয়ন্ত্রণের দিকটা?

ডা. সাহা ঃ মশা নিয়ন্ত্রণ তো একটা বিরাট এফর্ট। সমস্ত স্তরে ...

বি. ম. ঃ স্যার, একটা তথ্য পেয়েছি যে, ব্রাজিলের একটা সংস্থা থেকে এক ধরনের মশাকে – জেনেটিকালি মডিফায়েড মশা – যেটা নাকি ...

ডা. সাহা ঃ বুঝতে পেরেছি। মশাগুলিকে জেনেটিকালি মডিফায়েড করে দেওয়া হয়েছে – যাতে করে রিপ্রোডিউস করতে না পারে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে মেল মশাদের এমনভাবে করে দেওয়া হয়েছে – যেগুলো ইমপ্রেগনেন্ট করতে না পারে। এগুলো এক্সপেরিমেন্টাল স্তরে ঠিক আছে। কিন্তু পাবলিক হেলথ মেজার হিসেবে কতটা সাকসেসফুল – প্রমাণিত হয় নি। রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে করা হয়েছে এবং রিপোর্ট আছে – তারা বলছেন যে – হ্যাঁ ঠিক আছে। প্রমাণিত এখনো হয়নি। কিছু এফেকটিভ হয়েছে। কিন্তু মাস স্কেলে হতে হলে এনভায়ার্নমেন্টাল সেক্টরের কনসার্টেড এফর্ট লাগবে। তার মধ্যে আমি, আপনি আছি। আমাদের কনট্রোলিং মিউনিসিপালিটি করপোরেশন আছে, বিভিন্ন যে ডিপার্টমেন্ট রয়েছে – হেলথ রয়েছে, লিগ্যাল ... । এরকম আছে অন্য দেশে আপনার বাড়িতে এসে ফাইন করবে। যদি দেখে যে, আপনার বাড়িতে মশার ডিম পাওয়া গেল, আপনাকে ফাইন করবে। ইউ আর পেনালাইজড্। তুমি হাজার টাকা ফাইন দাও। পরের দিন দেখবেন বাড়ির কর্তা সকাল বেলা উঠে দেখবে – "নেই তো রে বাবা! জল জমে মশার ডিম! আবার ফাইন যাতে না হয়!" এটা যতক্ষণ না হয়, হবে না।

কলকাতা শহরে করতে পারবেন? কেউ করতে দেবে না তো আপনাকে। কেননা সবাই চিপ পপুলারিটি নেব। কিন্তু আসল হল মানুষের স্বাস্থ্য।

বি. ম. ঃ কিন্তু যেখানে রাস্তার পাশে ড্রেইনে জল জমে থাকে কিংবা গ্রামাঞ্চলে বদ্ধ জলাশয় রয়েছে?

ডা. সাহা ঃ ওগুলোতে ডেঙ্গুর মশা থাকে না। অন্য মশা থাকতে পারে। ডেঙ্গুর মশা কিন্তু পরিষ্কার জলে থাকে। ছোট্ট ছোট্ট জমা জলে যেগুলো আমার আপনার হাতে আছে।

বি. ম. ঃ এই ধরুন আমরা তো সাধারণ একটু জ্বর-টর হলে অনেকসময় ডাক্তারবাবুদের কাছে যাই এবং একটা জিনিস জেনেছিলাম – সর্দি-জ্বর এগুলো নাকি ভাইরাল।

ডা. সাহা ঃ ডেঙ্গুটাও কিন্তু ভাইরাল।

বি. ম. ঃ হ্যাঁ তা ঠিক আছে। আচ্ছা ভাইরাল জ্বরে নাকি অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। কিন্তু আমি এক ডাক্তারবাবুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম – আমাকে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন কেন? তখন উনি একটা কথা বলেছিলেন – সেকেন্ডারি ইনফেকশন, সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য। তাহলে ধরুন ৯৫%-এর বেশি ডেঙ্গু রোগ যেখানে আনডিফারেনশিয়েটেড – সেক্ষেত্রে সেকেন্ডারি ইনফেকশন যাতে না হয় তার জন্য একটা অ্যান্টিবায়োটিক ...

ডা. সাহা ঃ ডেঙ্গুর উপর সেকেন্ডারি ইনফেকশন চাপে

না। আপনাকে যেটা ডাক্তারবাবু বলেছেন, সেটা হল – রেসপিরেটরি ভাইরাল ইনফেকশন। এই ধরুন সর্দি কাশি ... অনেক সময় সেকেন্ডারি ব্যাক্টেরিয়া এসে চাপে। ডেঙ্গুর উপর ব্যাক্টেরিয়া চাপে না।

তবে ডেঙ্গুর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড – কারো যদি ডেঙ্গু জ্বর ছাড়ছে না, যদি টেস্ট করে দেখা যায় – কারো ম্যালেরিয়া হয়েছে, কারো টাইফয়েড হয়েছে তা চিকিৎসা করতে হবে। ডেঙ্গুর জন্য কিন্তু কোন অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না, এটাই আমি বলতে চাইছি।

বি. ম. ঃ এটা ঠিকই আছে। একটা সাধারণ জ্বর হয়েছে। বললেন না যে – প্রথমেই একটা কথা, আমাদের কারো ডেঙ্গু হয়ে থাকতে পারে – টেস্ট করার প্রয়োজন হয়নি। সাধারণ ডাক্তারবাবুর কাছে গেছি – অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলেন, দোকান থেকেও তো এমনি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেন কিছু না কিছু।

ডা. সাহা ঃ না, উচিত না।

বি. ম. ঃ না জেনেই দিয়ে দেয়।

ডা. সাহা ঃ আপনারা যখন লেখেন, এইটা বলতে হবে আপনাদের। দোকানদার কেন অ্যান্টিবায়োটিক দেবে? আমি কেন দোকানদারের থেকে অ্যান্টিবায়োটিক খাব? বলতে পারেন ডাক্তাবাবুকে দেখাতে গেলে আমার ১৫০-২০০ টাকা লাগবে। ঠিকই তো। কিন্তু আমি কোনও হাসপাতালে বা সরকারী পরিষেবার কাছে যেতে পারি। শহরাঞ্চলে তো মোটামুটি অ্যাভেইলেবেল আছে, গ্রামাঞ্চলে হয়ত অসুবিধা আছে। এটা আমার ব্যক্তিগত মত বলছি – এন্টিবায়োটিক কিন্তু দোকানদারের কথায় খাওয়া উচিত নয়। এটা করে আমরা দেখেছি – নানা ধরনের সমস্যা হয়। ওষুধ পরে কাজ করে না। কাজেই দোকানদারের কাছ থেকে প্যারাসিটামল খাওয়া যেতেই পারে; অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু দোকানদারের অ্যাডভাইসে খেতে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্ট্রংলি ডিসকারেজ করি।

বি. ম. ঃ আপনাদের এখানে কি ভাইরাস নিয়ে গবেষণামূলক কোনও কাজ হয়?

ডা. সাহা ঃ আমাদের এখানে ভাইরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে কাজ হয়। কিন্তু এটার আরও উন্নতি হওয়ার দরকার আছে।

বি. ম. ঃ একটা সোর্স থেকে দেখেছিলাম – জীবানু যুদ্ধ (বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার), তাতে ১৯৫০-এ ডেঙ্গুকে বাছা হয়েছিল – এরকম একটা সূত্র। এ সম্পর্কে কিছু জানা আছে? এবং একটা জায়গায় লিখেছে – ডেঙ্গু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ব্যাপকতায় ছড়িয়ে পড়ে। চীনাদের এনসাইক্লোপিডিয়া – তাতে রয়েছে ২৬৫ থেকে ৪২০ খ্রীষ্টাব্দে – এই সময় ওখানে ডেঙ্গুর খোঁজ পাওয়া গেছে – মানে লিখিত ইতিহাসের মধ্যে। এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন সময়ে ডেঙ্গু হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় তা আস্তে আস্তে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।

ডা. সাহা ঃ ইঙ্গিতটা হচ্ছে – তৈরী করা হয়েছে। আমি জানি না। তবে ডেঙ্গু ছাড়াও অনেক ডিজিজ আছে – যা ছড়িয়ে দেওয়া অনেক ইজি। এটুকু আমি বলতে পারি। অনেক অসুখ আছে যেমন – অ্যানথ্রাক্স – ছড়িয়ে দেওয়া কিন্তু অনেক ইজি। কাজেই আমাকে যদি চুজ করতে হয়, আমি তো অন্য অনেক কিছু চুজ করতে পারি। ডেঙ্গু কেন? আমি সেই জায়গা থেকে বলছি। এটা আমি জানি না। মানে আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বিভিন্ন পাওয়ারফুল জায়গা রয়েছে – আমরা তো ... কীটানু।

বি. ম. ঃ ডেঙ্গুর যে টাইপগুলো বললেন – একটা হয়ে গেলে সেটা আবার কাজ করে না। পর্যায়ক্রমে যে বিভিন্ন নতুন নতুন – ধরুন খবরের কাগজ পড়ে জানা গেছে – আগেরবার যেটা অ্যাটাক করেছিল, পরের বছর সেটা নয় – অন্য। আবার এখানে আলাদা করে একটা ক্রিয়েটেড ব্যাপার এসে যায় না?

ডা. সাহা ঃ নাও হতে পারে। ন্যাচারাল সিলেকসনও (প্রাকৃতিক নির্বাচন) তো হয়ে যেতে পারে। যারা আনফিট, তারা তো সারভাইভ করে না, চলে যায়। আমাদের লেজ চলে গেছে, অ্যাপেন্ডিক্স চলে যাচ্ছে। সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট (যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন)। সেভাবেও তো হতে পারে।

বি. ম. ঃ মিউটেশনও তো হতে পারে?

ডা. সাহা ঃ তাহলে চেঞ্জ করবে। মিউটেশন করে বাঁচতে চাইবে।

বি. ম. ঃ মিউটেশন তো প্রকৃতির মধ্যে হতে পারে, আবার ল্যাবরেটরিতেও হতে পারে।

ডা. সাহা ঃ আপনি যেটা ইঙ্গিত করতে চাইছেন, ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছি। কিন্তু সেটাকে বলার মত আমার এক্তিয়ার নেই। আমার জানা নেই। আমি বলতে পারব না।■

সংগঠন সংবাদ

দুবরাজপুরে ডাইনি সন্দেহে ৩ মহিলার হত্যার তদন্ত

গত ২৮শে অক্টোবর ২০১২, পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার দুবরাজপুর গ্রামে, ডাইনি সন্দেহে ৩ আদিবাসী মহিলাকে নৃশংসভাবে হত্যার তদন্ত করতে বিজ্ঞান মনস্ক'র ১২ জনের টীম সেখানে যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে পাঁশকূড়া, তারপর সেখান থেকে ঘাটালগামী বাসে দাসপুর এবং সেখান থেকে মেদিনীপুর গামী বাসে দুবরাজপুর যাওয়া হয়। হাওড়া থেকে ৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এলাকায় পৌঁছে দেখলাম যে গ্রামটিকে কোনভাবেই কোন দুর্গম এলাকায় অবস্থিত, এটা বলা চলে না। গ্রামের আদিবাসী পাড়াটি পাকা বাস রাস্তার ধারেই অবস্থিত। রাস্তার অপর পাড়ে উঁচু বাঁধ। বাঁধ থেকে নীচে নামলেই কংসাবতী নদী ও তার উপত্যকা। নদীর অপর পাড়ের বালির মধ্যে লাশ তিনটি পোতা ছিল বলে স্থানীয় মানুষরা জানায়। ওটা ডেবরা থানার অন্তর্গত।

প্রথমে আমরা যাই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এবং পঞ্চায়েতে তিনবারের প্রাক্তন প্রধান লক্ষণচন্দ্র সিং-এর বাড়ি। উনি শিক্ষিত, পাকা বাড়িতে থাকেন এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাকে বিবাহ করায় নিজের সমাজ থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন। কথা বলে জানা যায় যে, এই আদিবাসীরা প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যা থেকে একশ বছরেরও কম সময় আগে এখানে কাজের খোঁজে আসা মানুষ এবং কোল সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও জনগণনার সময় এঁদের মুন্ডা সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয়েছে সরকারীভাবে। কোল এবং মুন্ডাদের সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রচুর মিল। এদের সিং পদবী দেওয়া হয়েছে, এর পর থেকে এরা সবাই সিং। পাশের অঞ্চল ডেবরা, গোপীবল্লভপুরেই এই সম্প্রদায়ের বেশী মানুষ থাকেন। দাসপুর থানার দুবরাজপুর ও হরিরাজপুরে এই কোল সম্প্রদায়ের ৭০/৮০ টি পরিবার বসবাস করে। এদের মধ্যে মাত্র ৩টি পরিবার থেকে কেউ সরকারী বা সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ পেয়েছেন। ২/৩ টি পরিবার ছাড়া কারুরই চাষের জমি নেই, হয় অন্যের জমিতে কাজ করেন নয়ত হাঁড়িয়া তৈরী ও চালানের কাজ করে নারী-পুরুষ সকলে। প্রায় সকলেই বি পি এল কোটায় ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন। সরকার ওদের এক চিলতে জমি ও তাতে বিদ্যুৎও দিয়েছে। গ্রামে অন্য গ্রামগুলির মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে এবং সাড়ে তিন কি. মি দূরে হাসপাতাল আছে। যদিও এদের কেউই প্রায় সেখানে যায় না। গুণীনের কাছ থেকে ঝাড়-ফুক, তাবিজ-কবজ জলপড়া ইত্যাদি টোটকা নেয়। বয়স্ক মানুষদের মধ্যে মহিলারা অধিকাংশই নিজস্ব ভাষা (ওড়াং চিকি) ছাড়া অন্য ভাষা প্রায় বোঝেনই না। বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায় এবং বাংলাতেই লেখাপড়া করে। আদিবাসী পাড়ার চারপাশে থাকা বাঙালী (মূলত কৃষক) দের সাথে এদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রায় কোন সম্পর্কই নেই।

আমরা প্রথমে যাই কংসাবতীর পাড়ে, যেখানে গত ১৬ই অক্টোবর ঘটেছিল সেই নৃশংস গণহত্যা। এলাকাটাবাসরাস্তার ধারে হলেও খুবই নির্জন এবং উঁচু বাঁধের উপস্থিতির জন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া মানুষের কানে আর্ত-চিৎকার বা দলবেঁধে মারার কোন আওয়াজ শোনাও বাস্তবে সম্ভব নয়। ওই তিন মহিলা – ফুলমনি সিং (৬০ বছর), তাঁর মেয়ে সোমবারি সিং (৪৫ বছর) এবং পড়শি রিসা (এরও অপর নাম সোমবারি) সিং (৪০ বছর)কে মারার সময় তাঁদের মাথার চুলগুলিও টেনে টেনে ছেঁড়া হয়েছিল, যার কিছু অংশ তখনও নদীর পাড়ের বাঁশঝাড়ে ঝুলছে। ঋতু পরিবর্তনের জন্য হওয়া ভাইরাল জ্বর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার জন্য, পাঁচবছর আগে টি বি রুগী জীতেন সিং এর মৃত্যু, কয়েক বছর আগে হরিরাজপুরে কালা সিং-এর সাপে কেটে মৃত্যু এবং ৩/৪ মাস আগে দুবরাজপুরের শিবু সিং এর ব্যায়াম করতে গিয়ে মৃত্যু – ঐ সবকিছুর জন্য কোন অশুভ শক্তি দায়ী, এই প্রচার শুরু করে সমাজের মাতব্বররা। তারা গড়বেতার আনন্দনগরে যান জানগুরুর কাছে, এইসব অশুভ ঘটনাগুলি থেকে মুক্তি পেতে। ফিরে এসে তারা সালিশি সভা ডাকেন। সভা হয় পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়ির পাশে। এই প্রচার চলে যে, গ্রামের তিন মহিলার শরীরে অশুভ আত্মা প্রবেশ করেছে, ওরা ডাইনি, তাই ওদের হত্যা করতে হবে। ডাইনিদের হত্যা করলেই ওই তিন মহিলাসহ সমাজের সকলের জীবন থেকে অভিশাপ দূর হবে । ফুলমনির ছেলে বুধা সিং মা ও দিদিকে এই অপরাধের হাত থেকে বাঁচাতে মাতব্বরদের চাপে সভা ডেকেছিল। দুই গ্রামের সমস্ত নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে বিচারে রায় হল এই তিনজন ডাইনি। ওদের হত্যা করতে হবে, না হলে ডাইনির অভিশাপে সমাজের সকলের জীবন ছাড়খাড় হয়ে যাবে, এটা জানগুরুর নির্দেশ।

এই সিদ্ধান্তের খবর কিন্তু প্রশাসনের অজানা ছিল না। লক্ষণচন্দ্র সিং বলেন যে খবর পেয়ে তিনি এক স্থানীয়

রাজনৈতিক পার্টি নেতাকে ফোন করেন। নেতা তখন দাসপুর থানায় বসে ছিলেন। দুপুরে সেই খবর পেয়েও আধ ঘণ্টা দূরত্বের থানা থেকে তৎক্ষণাৎ কোন ব্যবস্থা নেওয়া হল না। লক্ষনবাবুও আর কোন পদক্ষেপ নিলেন না। তাঁর কথায় আমি খবর পাই 'সভায় মিটমাট হয়ে গেছে'। কি মিটমাট হল? যারা মারার ষড়যন্ত্র করছে তাদের কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? তিনি বললেন অন্য ব্যস্ততার জন্য কোন খবর নিতে পারেন নি। পঞ্চায়েত সদস্যার এ বিষয়ে কি ভূমিকা ছিল তাও আমরা জানতে পারিনি। কারণ তাঁর বাড়িতেও তালা ঝুলতে দেখলাম। কিন্তু আদিবাসী নেতা/নেত্রী হয়েও তিনি এবং তাঁর স্বামী যে প্রশাসনকে দিয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়াতে পারেন নি সেটা পরবর্তী ঘটনাই প্রমাণ করে।

সকাল থেকে শুরু হয় তিনজনকে স্বীকার করানোর পালা, যে তারা ডাইনি। স্বীকারোক্তি করাতে প্রথমে ভয় দেখানো এবং তারপর চলে মারধোর। প্রতিরোধ করতে গিয়ে মার খান সোমবারির স্বামী লক্ষীকান্ত এবং দাদা বুধু সিং। তিন অসহায় মহিলার উপর চলল দু-গাঁয়ের (নিজ শ্রেণী ও সমাজের) মানুষের দানবিক অত্যাচার। রক্তাক্ত তিন মহিলা বুঝলেন এই অত্যাচার সহ্য করার আর শক্তি তাদের নেই। নিজেরা ডাইনি এটা মেনে নিলে হয়ত বা মুক্তি পেতেও পারেন এই ভেবে একে একে ৩ জন স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তাঁরা ডাইনি। সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য তাঁরাই দায়ী। এই ভাবেই দুই গাঁয়ের সকল মৃত্যু, অসুখ-বিসুখের দায় মাথায় নিয়ে ওই তিনজন ডাইনি হয়ে গেলেন।

এরপর ৩ জনের চুল ছিঁড়ে নিয়ে হেরাবাটির বাঁশঝাড়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তারপর মোটা বাঁশের লাঠির আঘাতে আঘাতে থেতলে যেতে লাগল তাঁদের শরীর। একে একে মৃত্যু ঘটল তিন নিষ্পাপ মহিলার। লাসগুলি কংসাবতীর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে বালির চড়ে পুঁতে দেওয়া হল। উন্মত্ত জনতা খেয়াল করেনি পোঁতার সময় হাত-পা বালির মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। পরদিন গ্রামবাসীরা খবর দেওয়ায় পুলিশ লাশ উদ্ধার করল। পুরো হত্যাকাণ্ড চলল সকাল থেকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত। পুলিশ দুপুরে খবর পেয়ে রাত ৮টা-সাড়ে ৮টায় গ্রামে নাকি ঘুরে গেছিল! কিন্তু তারা কোন্ ভূমিকা নিল? নিরব দর্শক সেজে, 'ওসব আদিবাসী সমাজের ব্যাপার এ ব্যাপারে নাক গলালে বিপদ' এই মতের বশবর্তী হয়ে চলে গেল। সমগ্র গ্রামের পঞ্চায়েত নিশ্চুপ, সরকারী ও বিরোধী পার্টিগুলি নিশ্চুপ, পুলিশ নিশ্চুপ, পাশের বাঙালী গ্রামবাসীরা নিশ্চুপ – প্রায় বিনা বাধায় একবিংশ শতাব্দীতে হাজার হাজার বছরের পুরানো প্রথা মেনে তিনজন মহিলাকে ডাইনি অপবাদে বিভৎসভাবে হত্যা করা হল।

ঘটনার পরদিন থেকে গোটা আদিবাসী পাড়া প্রায় পুরুষহীন। পুলিশ গ্রামে ঢুকে বৃদ্ধ, বৃদ্ধাসহ শিশু এবং এমনকি ৮ মাসের গর্ভবর্তী মহিলা (রিঙ্কু সিং)কে তুলে নিয়ে গেল।

গ্রামের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা, সকলেই ভয়ার্ত । আমাদের মিডিয়া বা পুলিশের লোক ভেবে কেউ কোন কথা বলতে নারাজ। অনেকে বলল 'ওরা তো স্বীকার করেই নিয়েছে যে ওরা ডাইন ছিল'। কিন্তু কখন স্বীকার করল? প্রথমেই কী? উত্তর পেলাম প্রথমে করেনি, অনেক মার খাওয়ার পর করেছে। রিসা সিং-এর বৌদিরা প্রথমে কোন কথাই বলতে চান নি। অনেকবার প্রশ্ন করার পর রিসা সিং-এর ভাগ্নী বলে "আমার পিসি কখনও ডাইন হতে পারে ? ওরা জোর করে ডাইন বানিয়েছে।" রিসার বৌদির মুখে জানা গেল যে তার ননদের বিয়ের সময় (একই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও) হরিবাজপুর ও দুবরাজপুর গ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল। তবে কি এই কারণেই রিসাকে এতদিন পর টার্গেট করা হল?

একদিনের সমীক্ষায় সমস্ত বিষয়গুলি ভালভাবে জানা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ছিলেন অনুপস্থিত এবং যারা ছিলেন তারা প্রায় মুখই খোলেনি। যতটুকু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে তা শুধুমাত্র বাচ্চাদের কাছ থেকেই। তারা সজল নয়নে আমাদের বিশ্বাস করে হোক বা না করে-তাদের কথা প্রতিবাদের সুরে রেখেছে এবং এই অন্যায় ঠেকাতে যে কেউ পাশের দাঁড়ায়নি সে কথাও গোপন করে নি।

এই অনুসন্ধান থেকে এই তিন মহিলাকেই ডাইনি বানানো হল কেন তার কারণ আমরা খুঁজে পাই নি। তার জন্য আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন। আমরা অনুসন্ধান করে যা বুঝেছি তার সংক্ষিপ্তসার হল: এই আদিবাসী পরিবারগুলি সমাজ ও অর্থনীতির মূল স্রোত থেকে আজও বিচ্ছিন্ন। হাজার হাজার বছর আগেকার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, তৎকালীন সংস্কারে আজও আটকে আছেন। সভ্যতার আলো এখানে পৌঁছায়নি। পুঁজিবাদী সমাজের খারাপ দিকগুলি যতটা বা তাদের মধ্যে ঢুকেছে প্রগতির কোন দিক নয়। বর্তমান সমাজ তাদের আজও ব্রাত্য করে রেখেছে মূল স্রোত থেকে। এঁরা বর্তমান অর্থনীতি থেকে বাস্তবে অনেকদূরে বাস করেন। প্রশাসন,পুলিশ, সরকার, রাজনৈতিক পার্টি সকলেই এঁদের আদিবাসী করে রাখাকেই শ্রেয় মনে করে। শ্রমজীবী অ-আদিবাসীদেরও

সেখানো হয় "ওরা আলাদা আমাদের মতো নয়"।

সমস্ত সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত এই কালো মানুষগুলি তাই নিজেদের পৃথক করে রেখেছেন। বংশপরম্পরায় একই উৎপাদন সম্পর্কে টিকে থাকায় তারা পুরানো রীতি-নীতি সংস্কারে আটকে আছেন। সমাজের মূল উৎপাদনের স্রোতে এঁদের যুক্ত করতে না পারলে এঁদের সংস্কারমুক্ত করা সম্ভব নয়। কুসংস্কার দূর হওয়া সম্ভব না।

সভ্য মানুষ হিসাবে আমরা যারা আজও বড়াই করি, এই ঘটনায় তাদের মাথা নীচু হয়ে যায়। ডাইনি সন্দেহে হত্যার ঘটনা এ দেশে, এ রাজ্যে কোন নতুন ঘটনা নয়– ২০০৮ থেকে ২০১২-র মধ্যে কমপক্ষে ১০০টি ক্ষেত্রে এরকম খবর সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে-পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম জেলা অথবা বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, অসম অথবা রাজস্থানে। এই মানুষগুলোকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য সমাজটার বদল জরুরী। আসুন সেই কাজে আত্মনিয়োগ করি।■

শিলিগুড়ির বাণীমন্দির বিদ্যালয়ে ভূমিকম্প নিয়ে সেমিনার

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১২ শিলিগুড়ির বাণীমন্দির রেলওয়ে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানমনস্ক পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ শাখার উদ্দ্যোগে 'ভূমিকম্প কি ও কেন' শিরোনামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রাক্তন ছাত্রদের ডাকে এই সেমিনার হয়। উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে প্রায় দেড় ঘণ্টার সেমিনারে ভূমিকম্প কী এবং তা হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ কী তা স্লাইড শো-র মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। ভূমিকম্প হওয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান-টেকটনিক প্লেটের ভূমিকা ও পরিচয় দেওয়া হয়। পৃথিবীর ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলি কোথায়, ভারতের ভূকম্প প্রবণ অঞ্চল কোথায় ও কেন তাও ব্যাখ্যা রাখা হয়। ভূমিকম্প নিয়ে নানা কুসংস্কারগুলির স্বরূপ তুলে ধরা হয় এবং এটি যে একটি প্রাকৃতিক ও নিরন্তর ঘটে চলা ঘটনা তাও ব্যাখ্যা করা হয়। গতবছর এইদিন উত্তরবঙ্গের ভূমিকম্প হয়েছিল বলে এবারও বিরাট কিছু ঘটবেই, এমনটা যে নয় তাও বলা হয়।

এরপর ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের বিজ্ঞান তুলে ধরা হয় এবং এ সম্পর্কে বর্তমান স্তর অবধি বিজ্ঞানের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হয়। অতীতে সফল পূর্বাভাস করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যে বহু মানুষকে জীবনহানির হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল তাও তুলে ধরা হয় এবং বর্তমানে সব দেশের সরকারই ব্যয়বহুল বলে এই কাজে উৎসাহ দিচ্ছে না তারও উল্লেখ করা হয়। এরপর ভূমিকম্প প্রতিরোধের বিজ্ঞান এবং ভূমিকম্পের সময় মানুষের করণীয় কী এবং কি ধরণের স্থাপত্য গড়লে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায় তাও ব্যাখ্যা করা হয়।

সেমিনারে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ ও প্রশ্ন করার ধরণ খুবই উৎসাহজনক ছিল। শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীদের সহযোগিতাও ছিল লক্ষ্যণীয়।

এরপর মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী এবং নীচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের কাছে হাতে কলমে বিভিন্ন কুসংস্কারের স্বরূপ তুলে ধরা হয়। ছাত্রছাত্রীরা খুবই উৎসাহের সাথে তাতে অংশ নেয়। শিক্ষক-শিক্ষকা এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমীক্ষণ পত্রিকা সংগ্রহ করার আগ্রহও ছিল লক্ষ্যনীয়।

সমীক্ষণের প্রচার

এই পর্যায় বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে কলকাতার বেহালায় সরশুনা কলেজ এবং বালীগঞ্জ সায়েন্স কলেজে সমীক্ষণ প্রচার করা হয়। ৬ই অক্টোবর ২০১২, বেহালার সরশুনা কলেজে সমীক্ষণ প্রচার করা হয়। সেদিন দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ায় কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম ছিল।

১৩ই অক্টোবর বালীগঞ্জ সায়েন্স কলেজে সমীক্ষণ প্রচার করা হয়। ওইদিন ভূতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রদের পুর্ণমিলন উৎসব ছিল এবং কলেজের বাকী বিভাগগুলি বন্ধ ছিল। সেদিন বহু মানুষ (অধিকাংশই পুর্ণমিলনে অংশগ্রহণকারী সিনিয়র জিওলজিস্ট) সমীক্ষণ সংগ্রহ করেন। অল্পবয়সী এবং পঠনরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ ছিল তুলনায় বেশ কম। অনেকে বিশ্ব উষ্ণায়ণ বিশেষ সংখ্যা (প্রথম বর্ষ, সংখ্যা ৩) নিয়ে নানা প্রশ্ন ও মতামত দান করেন। অনেকের মধ্যে আবার এই প্রচারকে অবজ্ঞা ভরে উপেক্ষা করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেছে। আমরা তাদের বলি বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রসঙ্গে আপনাদের জ্ঞান হয়ত অনেক বেশী, কারণ আপনারা বিজ্ঞানী। কিন্তু এই বিতর্কমূলক বিষয়ে কোন একটি বিজ্ঞান সংগঠন কি মতামত প্রকাশ করছে, তার যথার্থতা কতটা আপনারাই তা যাচাই করতে পারবেন এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা এসেছি। কয়েকজন পত্রিকা পড়ে মতামত জানাবেন বলেছেন। দু-একজন তাঁদের মতামতও জানিয়েছেন।

দুর্গাপূজার সময় উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ শহরেও ষ্টল থেকে বহু উৎসাহী পাঠক সমীক্ষণ সংগ্রহ করেছেন।

কালীপূজায় ঠাকুরপুকুরে বিজ্ঞান মনস্ক'র স্টল

কালী পূজার সময় ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে একটি পূজা প্যাণ্ডেলের বিপরীতে পোস্টার প্রদর্শনী ও স্টল করা হয়। আমাদের পোস্টার দেখে বহু মানুষ তাঁদের মতামত দিয়েছেন, সমীক্ষণ সংগ্রহ করেছেন। ডেঙ্গু এবং ঈশ্বর কণা নিয়ে সমীক্ষণে রচনা লেখার জন্য অনুরোধ করেছেন।■

তিন ডাইনির উপাখ্যান

– অপন মতিলাল

এই সেই কংসাবতী – এপাড়ে হয়েছে 'ডাইনি' হত্যা –
আর ওপাড়ের চরে বালিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল তাদের লাশ

– না না আমি ডান না; আর কতবার বলব? আমাকে বাঁচতে দাও! আর মেরো না আমি যে মরে যাব!

– হ্যাঁ মর মর। স্বীকার না করলে এভাবে মার খেতে খেতে মরবি। বল তুই-ই ডান।

এলোপাথারি লাঠির আঘাতে আঘাতে সোমবারির আর্তচিৎকার ক্ষীণ হয়ে আসছে। ভিতরে ভিতরে বাঁচার ইচ্ছে তখনো প্রবল। লক্ষীকান্তের প্রতিবাদ কে শুনবে। মারের ঘায়ে সেও হাল ছেড়ে দেয়।

অনেক বছর হয়ে গেছে। ভালবেসে বিয়ে করেছিলো সোমবারিকে। প্রেমকে সেদিন একটুও অমর্যাদা হতে দেয়নি। মাতব্বরদের চোখরাঙানীর তোয়াক্কা না করেই সোমবারিকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিলো লক্ষীকান্ত। প্রথম বাচ্চা হতেই ওদের অবাক করে দিয়ে মাতব্বরদের রক্তচক্ষু আর্দ্ররসে শান্ত হয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাসে বুক জুড়িয়ে গেল নব দম্পতির। কিন্তু এই সরলমনা দুই আদিবাসী তরুণ-তরুণী কি জানত – ওদের সমাজের নিয়ম কত কঠোর? মাতব্বরদের চক্ষুশূল হওয়ার পরিণতি কি ভয়ংকর। কোন্ অদৃষ্টের সাধ্য সোমবারিকে বাঁচায়? সোমবারির সাথে আরও দুজন। তার মা ফুলমনি আর পড়শি-বাড়ির রিসা সিং।

তিন জন অসহায় মহিলা। সমাজের চোখে আজ ওরা ডাইনি। এই সমাজেই ওদের জন্ম। একটু একটু করে বেড়ে ওঠা। ঠাকুমা-দিদিমার কাছে শুনেছে – ওড়িশায় ওদের আদি বাসভূমি। ওদের পূর্বপুরুষেরা বাঘ-ভালুকের সাথে লড়াই দিতো। জঙ্গল কেটে চাষাবাদ করতো। প্রকৃতির কোলে মানুষ, তাই প্রকৃতির মতই অনাবিল সরলতায় পূর্ণ ছিল মন। প্রকৃতি বিরুদ্ধ সভ্যতার সহজাত ধূর্ততা তারা জানত না। তাই তারা মহাজনকে বিশ্বাস করেছে, জমিদারকে বিশ্বাস করেছে, মিশনকে বিশ্বাস করেছে। আর বার বার ঠকেছে। তাদের সংস্কৃতি ও ধর্ম হয়েছে বিপন্ন। শেষে ভূমি দাসে পরিণত হয়ে, বেগার খেটে নির্মম নিপীড়নে দিন কেটেছে। অরণ্য ছিল আদিবাসীদের মা। আকালে

ক্ষেত জ্বলে গেলে অরণ্য তাদের বাঁচাত। কন্দ, মূল, ফল, মধু, মাংস দিত। মায়ের কোল শিশুর জন্মগত অধিকার। এই অধিকারও যখন কেড়ে নেওয়া হল, দলে দলে আদিবাসী পালিয়ে গেল কয়লা খাদানে, চা বাগানে, ইট ভাটিতে – কাজের খোঁজে। ওরকমই একটা সময় কাজের খোঁজে ওরাও এখানে চলে আসে। তারপর থেকে যায়।

আদিতে ছিল ওরা কোল। সরকার ওদের বানিয়ে দিয়েছে মুন্ডা। সে গল্পও শুনেছে বাপ-ঠাকুরদার কাছে। তবে মুন্ডাদের সঙ্গে ওদের আচার-রীতির গভীর মিল আছে। ওড়িশার মূল জাতি থেকে এখানে ওরা গুটিকয়েক পরিবার বিচ্ছিন্ন থাকলেও, ঐতিহ্যের গর্ব আর দারিদ্র, অশিক্ষা ও কুসংস্কার নিয়ে ওদের দিন কাটছিল। মরদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওরা কাজ করেছে। সন্তানের জন্ম দিয়েছে, লালন-পালন করেছে, তাদের বড় করেছে। আর পাঁচটা পরিবারের মত ওরাও তিল তিল করে নিজেদের পরিবার গঠন করেছে। বেঁধে রেখেছে – কখনো স্ত্রী, কখনো মায়ের ভূমিকায়; আবার কখনো নিজেদের উপজাতির একজন হয়ে। আজ ৭০/৮০টি পরিবার। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার দুবরাজপুর ও হরিরাজপুর নিয়ে ওদের সমাজ। যে সমাজ গড়তে কারো থেকে ওদের অবদান এতটুকু কম নয়, যে সমাজের সঙ্গে নিজেদের সত্তার একবন্ধন অনুভব ক'রে গর্বে ওদের বুক ভরে ওঠে – সেই সমাজের চোখে ওরা আজ অপরাধী – ডাইনি।

ডাইনি, ভূত-প্রেত, তুকতাক, অলৌকিক শক্তি, পুরোহিতের অসীম ক্ষমতা – এসব বিশ্বাস ওদের সমাজে জাকিয়ে বসে, যখন ওদের ধর্মের উপর হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু ডাইনি সন্দেহে পৈশাচিক নির্যাতনের ঘটনা ওদের সমাজে আগে কেউ শুনেছে কিনা – বলতে পারেনি।

শরতের হিমেল ছোঁয়ায় এবছর ঋতু পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট ধরা দিচ্ছে। সর্দি-জ্বরেও আক্রান্ত হচ্ছে অনেকে। এনিয়ে মাতব্বরেরা ঘন ঘন বৈঠক করেছিলেন। শেষে কারণ খোঁজার নামে তারা গড়বেতায় আনন্দনগরে জানগুরুর কাছে যান। ফিরেই সালিশি ডাকেন। পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ির কাছেই। মহালয়ার সুরে এখনো চারিদিক ম-ম করছে। সপ্তাহ না ঘুরতেই ঢাকের আওয়াজে বাঙালী হৃদয় সপ্তসুরে নাচবে। মাতৃবোধনের আয়োজনে গোটা পশ্চিমবঙ্গ গা-ঝারা দিয়ে উঠেছে। বৃষ্টির অভাব, ফুটিফাটা মাঠ, ধানের চাষ বন্ধ, কৃষকের হতাশা, কারখানায় শ্রমিকের অমানবিক খাটুনি, তার ওপর কর্মী ছাঁটাই, আকাশ ছোঁয়া জিনিসপত্রের দাম, সরকারী কেলেঙ্কারী, ডেঙ্গুর ভয়াল আক্রমণ – সব বঞ্চনা-ক্লান্তি-গ্লানি চাপা পড়ে গেছে। চাপা পড়ে গেছে শিকড় ছিন্ন হয়ে বলতে গেলে বাঙ্গালী সমাজের কোলের মধ্যে এসে আশ্রয় নেওয়া কোল বিচার-সভার এই নির্মম প্রহসন।

কাশফুল ফুটে আছে। নীল আকাশে পেজা তুলোর মেঘ ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছে। শিশির ভেজা শিউলি তার বিছানো আঁচল সবে গুটিয়েছে, নিষ্কর্মা নব-দম্পতিদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে। এমনই সকালে রিসাকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয় বিচার সভায়।

বুধু সিং ডেকেছিলো সভাটা। মাতব্বরদের ইন্ধনে। বুধু সিং ফুলমনির ছেলে, সোমবারির দাদা। মা-দিদিকে ডাইনি বানানো হবে আগেই খবর পেয়েছিলো। তাই মাতব্বরদের ও গাঁ-বাসীদের নিয়ে এর একটা সুরাহা করতে চেয়েছিল। মা-দিদিকে চেয়েছিলো এ অপবাদ থেকে মুক্ত করতে। কিন্তু মাতব্বরদের কঠিন খড়্গ যে কতদূর ভেদ করতে পারে তা বুধু সিং-এর জানা ছিলো না। বিচারের রায় ঘোষণা হল – ফুলমনি, সোমবারি, রিসা সিং – তিন ডাইনি। কিন্তু তাদের দোষ নিজ নিজ মুখে কবুল না করা পর্যন্ত তো অন্তিম শাস্তি লাগু করা যাবে না। স্বীকারোক্তি আদায় করতে প্রথমে নির্দেশ, পরে ভয় দেখানো হল। এতে কাজ হল না – এবার বেধরক মার। প্রতিরোধ করতে গিয়েও মার খেল সোমবারির স্বামী লক্ষীকান্ত সাথে দাদা বুধু সিং। তিনজন অসহায় মহিলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'গাঁয়ের মিলিত মানুষের আক্রোশ। এভাবে থেকে থেকে চলল মারধরের পালা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। মাস্টারমশাই লক্ষণচন্দ্র সিং খবর পেয়ে স্থানীয় এক রাজনৈতিক পার্টি কর্মীকে ফোন করেন। পার্টি কর্মী তখন স্থানীয় দাসপুর থানায়। মাস্টারমশাইও আদিবাসী সম্প্রদায়ের। তবে শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে গিয়ে, ভিন্ সম্প্রদায়ের মেয়ে বিয়ে করে, এখন বলতে গেলে নিজের সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন। উঠেও এসেছে নিজের বাড়ি ছেড়ে। বাঙ্গালীদের সাথে তার এখন অবাধ মেলামেশা। আদিবাসীরাও তাকে আর নিজেদের সম্প্রদায়ের বলে ভাবতে চায় না।

ইতিপূর্বে দু'দুবার থানায় খবর যায়। কে উটকো ঝামেলা সামলাতে যাবে? ওরা মানে না সভ্য মানুষের নিয়ম কানুন। মেশে না বাইরের কারো সাথেও। ওদের মাতব্বরদের বিধান ছাড়া অন্য কিছু মানে না। সরকার স্কুল দিয়েছে। তবে ওড়াংচিকি পড়ানো হয় না। ওড়াংচিকি ওদের মাতৃভাষা। একভার হাঁড়িয়া আর পাঁচ টাকা হাতে পেলে পাশের গা থেকে হাঁড়িয়া বয়ে আনবে। কে আর স্কুলে যায়! সরকারি লাইসেন্সে ওখানেই চোলাই মদের আরত। বাড়ির মেয়ে-ছেলেরা হাঁড়িয়া

নামাঙ্কিত চোলাই মদ বেচাকেনা করে। মরদরা বয়ে নিয়ে আসে। হাঁড়িয়া খাওয়া, বেচা-কেনা – এই করে ওদের দিন চলে যায়।

হাঁড়িয়ার চল ওদের অনেক পুরনো। এটা ওদের পানীয়, পূজা-ধর্মকাজে লাগে। চাল থেকে তৈরি হত এই হাঁড়িয়া। তাতে ক্ষতি হত না বিশেষ। তাতে ওদের মধ্যে মদের নেশা ঢোকেনি। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশ সরকার আবগারি লাইসেন্স দিয়ে পাঁচ-দশ মাইল দূরে দূরে মদের দোকান বসিয়ে দিল। ওদের নেশাড়ে করে তুললো। ব্যবস্থাটা যদিও আজ বদল হয়েছে (হাত বদল), অবস্থাটা বদলায়নি।

তাবে মাঝে মাঝে ওরা অন্যের জমিতেও কাজ করে। কোন বাড়তি চাহিদা নেই। প্রশাসনেরও কোনও মাথা ব্যথা নেই। তারপরও সরকার ওদের বিপিএল বিদ্যুৎ দিয়েছে। কিছু জমি দিয়েছে। তাতে তেমন একটা চাষবাসও করে না। গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। হাল অবশ্য অন্য সব গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতই। সাড়ে তিন কিলোমিটার অদূরে হাসপাতাল। তা রেখে গুনীনের কাছ থেকে ঝাড়-ফুক, কবজ-তাবিজ, টোটকা চিকিৎসা নেয়। এই অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ডুবে থাকা কালো মানুষগুলির জীবনে যে কোন জীবন-মরণ সমস্যা হতে পারে, প্রশাসনেরও যে সেখানে কোনও দায় থাকতে পারে – তা মনে হয় খাকি উর্দি পরা মানুষগুলি কখনো ভাবতেই পারে নি।

বিস্কুটে থু-থু লাগিয়ে কুকুর লেলিয়ে দিলে ছুঁড়ে দেওয়া বিস্কুট, কুকুর গপ্ করে মুখে পুরে নেয়। ওরা মনে হয় কুকুরের জাত না। কারো এঁটো খেতে ওদের রুচিতে বাধে। অন্যের অধীনতা ওরা চায় না। বার বার দাসত্বের কবলে পড়েছে তো – এর যন্ত্রণা জানে। তাই বলে ভাববেন না শোষণ কবলিত উপজাতিগুলির জীবন প্রবাহ কেবল নিস্তরঙ্গ দাসত্ব আর পালিয়ে বাঁচার ইতিহাস। প্রচন্ড স্বাধীনতা-স্পৃহ ও শৃঙ্খলাপরায়ন এই উপজাতিগুলির বঞ্চনা-নিপীড়ন সহ্য করে করে যখনই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে – তখনই জন্ম নিয়েছে নেতৃত্ব। হারানো জমি-জঙ্গল-স্বাধীনতা ফিরে পেতে বীরের মত লড়েছে একের পর এক রক্ত-ঝরা লড়াইয়ে। প্রাণ দিয়েছে অকাতরে। এ পথেই ১৭৮৯-১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহু লড়াইয়ে মুন্ডারা রক্ত ঝরিয়ে শেষে পিছু হটে। কিন্তু এদের বিক্ষোভ থেকেই জন্ম নেয় ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ংকর কোল বিদ্রোহ। তারপর ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ – 'হুল'। পরের বছরই ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহ; প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। যদিও এ যুদ্ধ সরাসরি আদিবাসীদের লড়াই ছিলো না। কিন্তু পূর্ববর্তী সাঁওতাল ও কোল বিদ্রোহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলো। তারপর ১৮৫৮ খ্রীঃ থেকে দীর্ঘ ৪০ বছরের সর্দার আন্দোলন; যদিও তা রক্তক্ষয়ী পথে হাঁটেনি। এরই মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন আবার জ্বলে ওঠে ১৮৭১ এবং ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮০-৮১'র বিদ্রোহ প্রথম বারের মতই ভীষণ আকার ধারণ করে। অবশেষে ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে গণ বিদ্রোহ "উল্‌গুলান" – দাবাগ্নির স্ফুলিঙ্গে শক্তিশালী ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। আজকের এই বিচ্ছিন্ন শান্তিপ্রিয় আদিবাসী শাখাটির দেহে বইছে পূর্বপুরুষের বিদ্রোহী রক্ত, অন্তরে স্বাধীনতার স্পৃহা। ছুঁড়ে দেওয়া খাবারে তাই হয়ত ওদের রুচি নেই।

প্রাচীন জনগোষ্ঠীর উত্তরসূরি হিসেবে টিকে আছে সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা, ওরাওঁ, হো প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠী। কিন্তু অ-আদিবাসীদের আক্রমণে এদের অস্তিত্ব বার বার বিপন্ন হয়েছে। একঘরে হয়ে পড়েছে। এ ইতিহাস বহু প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব দুই থেকে দেড় হাজার বছর আগে আর্যরা মধ্য এশিয়া (মেসোপটেমিয়া) থেকে এসে প্রথমে পূর্ব পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করে। সেখানে আর্যদের বোঝাপড়া করতে হয় প্রধানত আগে আসা দ্রাবিড় উপজাতিগুলির সঙ্গে। এদের সাথে দ্রুত মিশে গিয়ে আর্যরা বিকাশের আরও উন্নত স্তরে উন্নীত হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে মুন্ডা উপজাতিগুলির সাথে পরম্পরা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কাজটা ঘটেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। ক্রমান্বয়ে আর্যরা গঙ্গা-উপত্যকা ধরে পূর্বাঞ্চলের দিকে অভিযান চালায়। বিকাশের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে থাকা মুন্ডা উপজাতিগুলির সাথে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ও তাদেরকে গভীর জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘ সময় ধরে পরস্পর সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও মুন্ডা উপজাতিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন তারা করেনি। একারণে বৈদিক সংস্কৃতির ওপর মুন্ডা ভাষাগুলির প্রভাব লক্ষণীয়রকম কম দেখতে পাবেন।

উন্নতির ক্রমবিকাশের পথে এক সময় (আরো প্রাচীন কালে) সমান তাল রেখে চললেও আজ ওরা পিছিয়ে। ওদের বিচ্ছিন্ন করে রাখাই এই পিছিয়ে পড়ার কারণ। কিন্তু ওদের মধ্যে যে চারিত্রিক ঐশ্বর্য আছে – তাকে চিনতে না পারা, সম্মান না দেওয়া এই এগিয়ে যাওয়া মানুষের অপমানের। নিজেদের অপমান জেনে যতদিনে আমরা লজ্জিত হতে না শিখি, সঠিক পদক্ষেপ না নিতে পারি, ততদিনে আমরা যে উন্নত মানবিকতার দাবি করি – তার কলঙ্ক ঘুচবে না। ওরাও আমাদের সাথে মিলবে না। আজ ওদের দিকে লোক দেখানো দানের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অন্তরালে যদি যুগ যুগ ধরে চিতাবাঘ আর সাপের

সঙ্গে লড়ে ওদের হাসিল করা জল-জমি-জঙ্গল-পাহাড় হাতিয়ে নেওয়ার অভিপ্রায় থাকে – সে দান তো ওরা ছুঁড়ে ফেলবেই। হোক না এখানে ওরা বিচ্ছিন্ন। এখানে মাত্র একশ বছরের বাস কিন্তু ওরা আদিবাসী। সিধু-কানু-বিরসা মুন্ডার জাত। আবার একথাও সমান সত্য – ওরা পিছিয়ে পড়া অন্ধকারে-কুসংস্কারে ডুবে থাকা কালো মানুষের দল।

তাইতো ফুলমণিদের আর্তচিৎকার শুনতে পাচ্ছি। বিকেল গড়িয়ে সূর্য পশ্চিম আকাশে। ডানদের ছায়াগুলি লম্বা হয়ে আসছে। অন্য সকলেরও। কিন্তু ডানেরটাই শুধু চোখে পড়ে। অন্ধকার নামতেই দুষ্ট আত্মার মায়াজাল শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই মারধরও বাড়তে থাকে। ফুলমণিদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এত যন্ত্রণা সয়েও কেন ওদের বাঁচতে ইচ্ছে করছে! সংসারের প্রতিটি নির্মাণ আপন হাতে গড়া – তাই বুঝি। নিজ গতরে খেটে নির্মাণ করা আর অন্যদের গতরের নির্মাণ ভোগ করবার মধ্যে জীবন তৃষ্ণার এই বুঝি তফাৎ। মৃত্যু যন্ত্রণা সয়েও একজন বাঁচতে চায়, আর অন্যজন অনেক বাঁচার মধ্যেও মরতে চায়।

প্রাথমিক স্কুলের উঠোন পেড়িয়ে ওদের টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল বাঁধের ওপারে কংসাবতী নদীর তীরে। একটা উঁচু মাটির ঢিবি। উপরটা উপত্যকার মত সমতল। পাশেই ঘন বাঁশের ঝোপ। তার পাশ দিয়ে কলকল করে বয়ে চলছে কংসাবতী। এখানেই হাঁড়িয়ার হাট বসে। ফুলমণি কত এসেছে এখানে হাঁড়িয়া বেঁচতে। রিসাও এসেছে। ছোট বেলায়। এখন তো সে পাশের গাঁয়ের বউ। আজ এক ঝলকে ভিড় করে থাকা অতীতের কত স্মৃতি মনে উঠে আসছে। সেই কংসাবতী কি সোমবারিকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মরতে দেখে চুপ করে থাকতে পারবে? মৃত্যুর উপত্যকায় বসে সোমবারি যেন মাতৃস্নেহ-কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। এমন ভরসার বাণী ও জীবনে আর কখনো কারো কাছ থেকে পায়নি। বাঁচার জন্য সোমবারি ভিতরে ভিতরে আরো মরিয়া হয়ে উঠছে।

কিন্তু ভরসার স্বপ্নঘোর কাটতে না কাটতেই প্রহসনের পরবর্তী পর্ব অভিনীত হল। চুলের মুঠি ধরে শুরু হল প্রচন্ড মারধর। আর সমবেত চিৎকার।

– বল তোরা ডান।

বাঁচার এই একটা পথ ছাড়া বুঝি অন্য কোনও পথই খোলা নেই। এই মিথ্যা অপবাদ স্বীকার করেও যদি প্রাণে বেঁচে থাকা যায় সে ক্ষীণ প্রত্যাশায় অস্ফুটে বলে ফেলে –

– হ্যাঁ আমরা ডান।

– বাচ্চাগুলি তোরা খেয়েছিস?

– হ্যাঁ।

– জীতেন সিংহকে কে খেয়েছিল?

– জীতেন সিং তো টিবিতে ভুগতে ভুগতে শেষে ক্যান্সারে মারা যায় পাঁচ বছর আগে।

– না, তাকে তোরাই খেয়েছিস।

– হ্যাঁ।

হরিরাজপুরের কালা সিং সাপের কামড়ে মারা যায় অনেক বছর আগে। তার স্ত্রী রিসার দিকে তেড়ে আসে।

– আমার স্বামীকে তুই খেয়েছিস।

– হ্যাঁ।

– শিবুকে কে খেয়েছিস? (ফুলমণির দিকে) তুই খেয়েছিস?

– হ্যাঁ।

এ গাঁয়ের শিবু সিং ব্যায়াম করতে গিয়ে মারা যায় তিন-চার মাস আগে।

– তাকেও তোরা খেয়েছিস?

– হ্যাঁ।

এভাবে এক এক করে দুই গ্রামের সকল মৃত্যু ও অসুখ বিসুখের অপবাদ-দায় মাথায় নিয়ে ফুলমণি, সোমবারি ও রিসা প্রকৃত ডাইনি হয়ে ওঠে।

স্বীকারোক্তি-ই যখন আদায় হল, প্রহসনের যবনিকা পর্ব অভিনীত হতে তো আর বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। তিনজনের চুল ছুলে সেই রক্তমাখা চুল ঝুলিয়ে দেওয়া হল হেরাবাটির বাঁশ ঝাড়ে। নারী-পুরুষের যৌথ আক্রমণে মোটা বাঁশের লাঠির আঘাতে আঘাতে তিনটি প্রাণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ডাইনি হত্যার মঙ্গল কর্মে যারা আজ যোগ দিল, তারা পূণ্যবান–পূন্যবতী হয়ে যে যার ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু তার আগে একটি কাজ বাকি আছে। নিথর দেহগুলি কংসাবতীর বুকের উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যারা ওপারে বালির চড়ে পুঁতে দেয়; কংসাবতী কি তার ছলাৎছলায় তাদেরও অভিনন্দন জানিয়েছে? শক্তি যুগিয়েছে এ কাজে?

ঘটনার পরের দিন বুধবার পুলিশ এসে বালিতে পোঁতা দেহ তিনটি উদ্ধার করে। ফুলমণি ও সোমবারির লেপা-পোছা পরিচ্ছন্ন পাশাপাশি ঘর দুটি তালাবন্ধ। সোমবারির ছেলে বর্ষা আর রিসার ভাই সাধুকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। গাঁয়ের মরদরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। মহিলারাও অনেকে। শেষে নির্দোষ কয়েকজনকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কোন মা দুধের বাচ্চা কোলে, আবার কেউ আট মাসের গর্ভবতী – রিংকু সিং। কেউ কেউ অতি কষ্টে যে ছিটেফোটা ফসলটুকু ফলিয়েছিলো, এখন তা মাঠেই লুটোচ্ছে। যে মহিলাদের বাড়িতে পাবেন তারা মুখে কুলুপ এঁটে আছে। ভিন জাতির যে বাঙ্গালীরা

ওদের খুব কাছাকাছি থাকে তাদের কথায় – "ওরা আদিবাসী, আমরা বাঙালী। ওদের সমাজ আলাদা। আমরা সেখানে কি করব?" এই আদিবাসী গোষ্ঠী যে দ্বিপদী মানুষ জাতীয় কোন প্রাণী – তাদের মতনই – একথা মনে হয় কোন দিন তারা ভাবনায় আনেনি। তাই চির ব্রাত্য এই কালো মানুষগুলির জীবন মরণের কোনও প্রহসনই তাদের দৈনন্দিন জীবন-কর্মে কোনও সাড়া ফেলতে পারে না। তবু আপনার মনে সাড়া ফেলবে, যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া আদিবাসী ক্ষুব্ধ মেয়েটি – রিসার ভাইয়ের বেটি, পাখি সিং হঠাৎ বলে উঠবে – "নিজের পিসি কি ডাইনি হতে পারে কোনদিন?"

উপাখ্যানটা এখানে শেষ করলে চলত।

ঠিকই তো। নিজের পিসি কি ডাইনি হতে পারে? নিজের পিসিই তো আবার নিজেই মা, কারো বোন, কারো ঠাকুমা। কোন মা-বোন-ঠাকুমা ডাইনি হতে পারে না। ডাইনি হয়ে কেউ জন্মায় না। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে – কোনও অতৃপ্ত দুষ্ট আত্মা কারো উপর ভর করে। অলৌকিক প্রভাবে তাকে দিয়ে নানান অশুভ কাজ করিয়ে নেয়। কারো সন্তানকে খেয়ে নেয়, কারো স্বামীকে, কারো অসুখ-বিসুখ ঘটায় – এরকম। কিন্তু প্রত্যেক মৃত্যু বা রোগের পেছনে এক বা একাধিক লৌকিক (বিজ্ঞান ভিত্তিক) কারণ থাকে। তবুও মানুষের জীবনে মৃত্যু এক অনিশ্চয়তা। জাগতিক সকল ঘটনাতেই কিছু পরিমাণ অনিশ্চয়তা থেকে থাকে (আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও)। এই অনিশ্চয়তা থেকেই মানুষ অলৌকিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে ভালবাসে। এই ভালবাসা যুগ যুগ ধরে মনে লালন করে আসছে। অথচ এই "কিছু পরিমাণ অনিশ্চয়তা – সার্টেইন ডিগ্রি অফ আনসার্টেন্টি" – এটা যে বিজ্ঞানেরই একটি বৈশিষ্ট্য, বিজ্ঞান স্বীকৃত – এটা না বুঝলে বিজ্ঞানকে বোঝা হয় না। সঠিক বিজ্ঞান মনস্ক হওয়া যায় না। বিজ্ঞানের ফল গ্রহণ করব (বিদ্যুৎ, টিভি, ডিস লাইন ...), অথচ বিজ্ঞানের নিয়মকে (আবিস্কৃত প্রকৃতির নিয়ম) মানব না; সেটা কেমন হয়!

মানুষ মোটেই মেনে নিতে পারে না – অনু-পরমাণু মিশে মাতৃগর্ভে জন্ম হয়েছিলো আমার, মৃত্যুর পর অনু-পরমাণু আবার বিশ্লিষ্ট হয়ে 'পঞ্চভূতে' বিলীন হয়ে যাবে। নিজের একটা চিরস্থায়ী অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে না পারলে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"। তাই জন্ম-মৃত্যুহীন আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তার মধ্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চায়। সেখান থেকেই অলৌকিক ধারণাগুলির জন্ম। স্বর্গ-নরক, ভূত-প্রেতাত্মা, ভাল আত্মা, মন্দ আত্মা, অতৃপ্ত আত্মা প্রভৃতি। এগুলি বেঁচে আছে মানুষের অন্ধমনে। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজে। তাই বলে কুসংস্কারের নামে এতবড় একটা সামাজিক ঘটনার দায় এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কুসংস্কার তো সেই সমাজেই টিকে থাকে যেখানে সঠিক শিক্ষার/জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো পৌঁছায়নি বা পৌঁছতে দেওয়া হয়নি; যেখানে অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটেনি বা ঘটতে দেওয়া হয়নি; সেখানে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে – আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে; সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত ভাবে। আদিবাসী আদিবাসী থাকুক; এস সি, এস টি, ও বি সি যে যা আছে তাই থাকুক।

আপনারা যারা আন্দামানে লাল চেলি পরা জারোয়াদের দেখে এসেছেন, ওড়িশার ফুলবণী অথবা কোরাপুটের বোন্দা পাহাড়ে নগ্ন বোন্দাদের ঘর সংসার দেখে এসেছেন, অথবা ঝাড়খন্ড, বিহার, বীরভূম, পুরুলিয়া কিংবা মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে কিছুটা হলেও পরিচিত – সত্য উপলব্ধির জন্য নিশ্চই তাদের সময় অপচয় করতে হবে না। তাই তো ফুলমণিরা যুগে যুগে ডাইনি হয়। তাদের মাতব্বরেরাও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে উদ্ভূত ভয়ংকর সমস্যাগুলি সমাধানের প্রত্যাশায় এমন সহজ-সরল পথ বেছে নেন। বঞ্চনার শিকার গোটা সমাজের মৃত্যু যন্ত্রণা নিয়ে "ফুলমণি-রিসা-সোমবারি"-রা করুণ আর্তনাদে বিদায় নেয়। বিদায় নিতে হয়। তা না হলে যে এ সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখাই দায়।

কি ভাবছেন আপনি? একবিংশ শতকের বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির চুড়োয় দাঁড়িয়ে কোথায় আমরা অন্য গ্রহে বিকল্প বসতি খুঁজছি অথচ নিজেদের বসত গ্রহটির এক দিক ঘন অন্ধকার করে রেখেছি। না খুঁজছেন – এ যুগের সিধু-কানু-বিরসা মুন্ডাদের ?

লড়াই যেন তুষের আগুন
ভাবছ বুঝি নিভেই গেল
কিন্তু এযে নেভার নয়
বাতাস যখন তুষ ওড়ায় –

আগুন জ্বলে এদিক ওদিক
শুকনো কাঠে শুকনো ঘাসে
সে আগুনে গা
যায় না সেঁকা
সে আগুন থেকে কাঠ
জ্বালতে শেখা।

[একটি হো গানের বাংলা অনুবাদ]

সত্যি ভূতের গল্প

– কাজল কুমার রায়

[*রচনাটি বিজ্ঞান মনস্ক'র সদস্য এক রেলকর্মীর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত*]

সন্ধ্যা নেমে আসছে। তিন মাইল হাট স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অপরিসীম। বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুরের এই অঞ্চলের চারদিকে সবুজ প্রান্তর। মাঠে ধান। কৃষকরা বলদ লাঙল নিয়ে ঘরে ফিরছে। হঠাৎ ৩৮ নং গেট থেকে খবর এল "বাবু, কাটা গেছে।" একটু আগেই নর্থ বেঙ্গল ডাউন গাড়ি পার হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই কন্ট্রোলকে খবর দেওয়া হল। একটা রানওভার হয়ে গেছে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে। পিছনে অনেক গাড়ি আছে – তিস্তা তোর্সা, তার পিছনে বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস ... । বডি না সরানো অবধি ট্রেন যেতে পারবে না। মাগুরজান স্টেশনে খবর দিয়ে দেওয়া হল। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে মেমো দিল 'একটা মেয়ে রান ওভার হয়ে গেছে'। এটা বিহার-বাংলা বর্ডার এলাকা। বডিটা বিহার এলাকায় পড়েছে। লাইনের ওপর লোকজনের ভিড়। বোধহয় ভক্তিয়াডাঙ্গি গ্রামের কোন মেয়ে হবে।

অল্প বয়সী মেয়ে রেলে কাটা পড়লে ধরে নেওয়া হয় কোন প্রেমঘটিত ব্যাপার নতুবা পরীক্ষায় ফেল। এই দুটোর মধ্যে কোন একটা হবে। বিহার জি আর পি দ্রুত কিষাণগঞ্জে খবর দিল। এ ব্যাপারে বিহার পুলিশ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ থেকে বেশী তৎপর, খুব দ্রুততার সাথে কাজ করে। এরও কারণ আছে।

স্টেশন থেকে পি ডবলু আই কে মেমো দেওয়া হল। পি ডবলু আই গ্যাংম্যান নিয়ে রওনা দিল স্পটে। স্টেশন আর পি এফ-কে খবর দেওয়া হল, গেটম্যানকে খবর দেওয়া হল। অ্যাক্সিডেন্টটা কোথায় হয়েছে গার্ড ড্রাইভার মেমো-তে তা জানিয়ে দিল। ড্রাইভার গার্ডকে ওয়াকি টকিতে সব জানানো হল।

পি ডবলু আই, আর পি এফ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে লাইনের উপর অনেক লোক। অন্ধকার হয়ে এসেছে। লোকগুলি ছায়ামূর্তির মত আশপাশের গ্রামে মিলিয়ে গেল। কি আশ্চর্য। খবর ছিল বডিটা লাইনের মাঝখানে পড়ে আছে। জোরালো টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল, না কোথাও তো কিছু নেই! লাশটা গেল কোথায়? হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! কোথাও তো লাশের কোন চিহ্ন নেই। কোন লোকজনেরও ভিড় নেই, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভক্তিয়াডাঙ্গি গ্রামে কোন ভিড় বা জটলাও নেই। চারদিক শান্ত, নিরুত্তাপ। অথচ কিছুক্ষণ আগেও প্রচুর কোলাহল শোনা যাচ্ছিল। আর পি এফ-রা জোরালো আলোয় ভাল করে নজর করল। বডি লোপাট, শুধু রেল লাইনের পাথরে রক্তের ছোপ লেগে আছে।

পি ডবলু আই বলল মেয়েটা ভূত হয়ে গেছে। আর পি এফ-ও সেই বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে ওয়াকিটকিতে স্টেশনে খবর দিল "কোন বডি নেই। কোন রান ওভার নেই।"

স্টেশন মাস্টার ঘাবড়ে গেলেও ভয়ে ভয়ে খবরটা কন্ট্রোলকে জানিয়ে দিল। ট্র্যাক ফিট সার্টিফিকেট, ট্র্যাক ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ফোনে দিয়ে দিল এই ভেবে, যাতে গাড়ি বেশী মার না খায়।

এদিকে কিষাণগঞ্জ থেকে জি আর পি চলে এসেছে। ট্রেনে অপঘাতে মৃত্যু মানেই তাদের পোয়াবারো! মরা নিয়ে শুধু টানা হ্যাচরা চলে। বাড়িশুদ্ধু সকলকে নিয়ে চলে টানাটানি। গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা তো নেবেই, সঙ্গে চলবে কোর্ট-কাছারির মস্ত হ্যাপা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। মৃত মানুষটার জন্য শোক ভুলে শুধু থানা-কোর্ট-উকিল আর গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা। এসবের জন্য প্রথমে চাই লাশ, কিন্তু তা কই? এই লাশের খবর দেওয়ার জন্য পুলিশের গ্রামে গ্রামে 'সোর্স' থাকে। কিন্তু এবার সোর্স-ও কোনও খবর দিতে পারল না।

এই ঘটনার বছর কয়েক আগে এই এলাকাতেই ফরিদ আলির বউ লাইনে কাটা পড়েছিল। সে গরু নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। গরুর গলায় ছিল মোটা নাইলনের দড়ি, যার অপর প্রান্ত ছিল বউ-এর হাতে। লাইন পার হওয়ার সময় খেয়াল করতে পারে নি। ডাউন রাজধানী চলে আসে। ফরিদ আলির বউ আর গরু একসাথে রানওভার হয়ে যায়। রাজধানীতে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। তাই মাত্র আধ ঘন্টা গাড়ি ডিটেন্ড হয়েছিল। অল কনসার্ন খবর দিয়ে পি ডবলু আই, আর পি এফ-কে মেমো দিয়ে বডি সরানো হয়েছিল। এরপর এল বিহার জি আর পি, পুলিশ। তারা এসেই ফরিদ আলিকে অ্যারেস্ট করল। ফরিদের বৃদ্ধ মা-বাবা

কাউকেই ছাড়ল না। এরপর চলল থানা, কোর্ট-কাছারি আর টাকা। ফরিদ আলি অবস্থাপন্ন তাই ঘাড় মটকে ভালই কামাই হল সকলের! সোর্সও কাজ করে ভাল রোজগার করল।

ফরিদ আলির ঘটনার বছর খানেকের মধ্যে আরও তিন-চারটে রানওভার হয়েছে। বেশীর ভাগই লাইন ক্রশ করার সময়। প্রথম দুটো ক্ষেত্রে সোর্স কাজ করেছিল। গ্রামবাসীদের ফরিদ আলির মতই প্রচুর হ্যাপা পোহাতে হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটল অন্যরকম, বেশ রহস্যময়!

কাটা পড়ল বদ্রী সিং-এর ছেলে। পি ডবলু আই, জি আর পি বডি আনতে গিয়ে দেখল কয়েক ফোটা রক্ত ছাড়া লাইনে কিছু নেই। বডি আবার লোপাট। শুধু এটাই রহস্যময় ব্যাপার এমন নয়। বদ্রী সিং-এর ছেলে কাটা পড়ার আগে অর্থাৎ দ্বিতীয় মৃত্যুর তিনদিন পর সোর্সরা বাড়ি ফেরার সময়, অন্ধকারে কতগুলো ছায়ামূর্তি তাদের ধরে বেদম ঠেঙিয়ে ছিল। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ভূতগুলি সোর্সদের ঠেঙানোর সময় হুমকি দিল–খবর দিলে ঘাড় মটকে খাব! খ্যান খ্যানে গলায় একটা ভূত না পেত্নী কে জানে, বলল–সে ফরিদ আলির বউ!

ভূতেদের এহেন অত্যাচারে সোর্সদের এতকালের দাপট আঘাতপ্রাপ্ত হল! এলাকার বিখ্যাত সোর্স মধুসূদন কর প্রভাবশালী, ৫০-৬০ বিঘা জমির মালিক। তিন মাইল হাট স্টেশন সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুরের ট্যাপাগছ, মোনাগছ, নিশাগছ, দুর্গাগছ, গৌরাঙ্গগছ ... গ্রামগুলিতে চলে তারই দাপট। মধুসূদনের ছেলে বর্তমানে সোর্স-এর কাজ করত। কিন্তু রেল লাইনে ভূতের প্রকোপে তার সোর্সগিরি প্রায় বন্ধ।

এর ফলে বদ্রী সিং-এর ছেলের বেলায় কোনও সোর্সই কাজ করল না। পি ডবলু আই, জি আর পি রিপোর্ট দিল 'নো রানওভার, বডি পাওয়া যায় নি।" এরপর থেকে এই অঞ্চলে কেউ রেলে কাটা পড়লেই সে 'ভূত' হয়ে যায়!

তিনমাইল হাট থেকে মাগুরজান রেলস্টেশন অঞ্চলে রেলে কাটা ভূতেরা আজও ঘুরে বেড়ায়। এখন এইসব ভূতেদের দাপট নিজবাড়ি স্টেশন থেকে আলুয়াবাড়ি স্টেশন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্যাংম্যানদের কাছ থেকে এই ভূতেদের খবর পাওয়া যায়। এরা রেলকর্মীদের উপর কোনও হামলা করেছে বলে শোনা যায় না। রেলের কোন স্টাফের এরা ক্ষতি করে না।

উত্তর বাংলার নিউ জলপাইগুড়ি সংলগ্ন এলাকার রেলে কাটা ভূতেরা তাঁদের পরিবার পরিজনের জীবনে শোক নিয়ে এলেও আগেকার আর্থিক দুর্দশার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। পুলিশী অত্যাচার আর আর্থিক জরিমানা বন্ধ করে দিয়েছে।

গ্রামগঞ্জে ভূতের প্রকোপ দেখা দিলে মানুষ ওঝা-গুণিনের কাছে ভূত তাড়াতে যায়। মন্দির মসজিদে যায়। কিন্তু তিনমাইল হাট থেকে আলুয়াবাড়ি অঞ্চলে বর্তমানে রেলে কাটা ভূতের সংখ্যা কম নয়। অথচ এই 'ভূত' তাড়াতে গ্রামের মানুষের কোনও উদ্যোগই দেখা যায় না। তাই 'ভূতেরা' নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায় গ্রামবাসীদের আশীর্বাদ নিয়ে!■

বিজ্ঞান মনস্ক গ্রামে বা শহরে গণসচেতনতা বৃদ্ধিকারী অনুষ্ঠান করে থাকে। আপনার এলাকায় কুসংস্কার বা সামাজিক অন্যায়ের ঘটনা ঘটলে আমরা তার স্বরূপ উদ্ঘাটন, অন্যায় দূর করার কাজে সহযোগিতা করে থাকি।

যোগাযোগের ঠিকানা

নন্দা মুখার্জী ঃ ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা,
কলিকাতা - ৭০০০৬৩,
ফোন - ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫
Email : samikshan2009@gmail.com

-ঃ বিজ্ঞানের খবর ঃ-

জুলাই ২

* বিজ্ঞানীরা Ultrasound ব্যবহার করে থ্রি-ডি ভিডিও কে Modified liquid soap Membrane- এর উপর প্রদর্শন করেছেন। এটিই বিশ্বের সব চাইতে পাতলা, স্বচ্ছ ভিডিও ডিসপ্লে। (BBC)

* Precisely Controlled Pores- থাকা Graphene পাতকে ব্যবহার করা যায় জল শুদ্ধিকরণ প্রকল্পে। এতে অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় সাফল্য বেশি আসে। (MIT)

জুলাই ৩

* বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে এই প্রথম একক পরমাণুর ছবি সংগ্রহ করেছেন। (Science Daily)

জুলাই ৪

* সার্ন-এর বৈজ্ঞানিকরা ঘোষণা করেছেন যে তাঁদের আবিষ্কৃত কণাটির সাথে 'হিগস বোসন' কণার সাদৃশ্য রয়েছে এবং এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ৩৫ লক্ষ ভাগের একভাগ। এই তত্ত্বকে '৫ সিগমা' বলা হয়। (BBC)

জুলাই ৫

* বিজ্ঞানীরা একক স্নায়ুকোষের ছবি প্রকাশ করেছেন। ভিডিও ফুটেজে কোষের মধ্যে একক প্রোটিনের ভিন্ন পথে চলাফেরার দৃশ্য ধরা পড়েছে। (Cell) (Gizmodo)

জুলাই ৬

* UCLA'- এর কারিগরী বিশারদরা তৈরী করেছেন এক অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন অপ্টিক্যাল অনুবীক্ষণ যন্ত্র যার সাহায্যে দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য ভাবে মানুষের রক্তে ক্যান্সার কোষ ধরা সম্ভব। (R & D Magazine)

জুলাই ৭

* Cambridge Declaration of Consciousness-এর বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন যে মানুষ অপেক্ষা অন্যান্য জীবজন্তু যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি এমনকি অক্টোপাসদের মধ্যেও সচেতন অনুভূতি লক্ষ্য করা গেছে। (Scientfic American)

জুলাই ১০

* Michigan State University-র গবেষকরা এক নতুন জৈব জ্বালানী তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতি পূর্ব পদ্ধতিগুলির চেয়ে ২০ গুণ বেশী শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম। (Science Daily)

* নাসা দাবী করেছিল ব্যাক্টেরিয়ারা নিজেদের DNA-তে Arsenic মৌলটি যুক্ত করতে সক্ষম। নাসা'র এই দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন গবেষকরা। (কেমিস্ট্রি ওয়ার্ল্ড)

জুলাই ১১

* ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি'র গবেষণায় ধরা পড়েছে যে Graphene মানুষের সহায়তা ছাড়া গঠন পরিবর্তন করতে সক্ষম। Graphene-এর এই গঠন সম্ভব হয় মুক্ত কার্বন পরমাণুকে একত্র করে। (গিজমোডো) (বিবিসি)

জুলাই ১৫

* বিজ্ঞানীদের ধারনা Dracunculiasis বা গিনি ওয়ার্ম ডিজিজ (জি ডব্লিউ ডি) প্রায় বিলুপ্তির পথে। বসন্ত রোগ (স্মল পক্স)-এর পর এটিই এমন এক মারণ ব্যাধি যেটিকে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। (সায়েন্টিফিক আমেরিকান)

জুলাই ১৬

* এফ ডি এ Truvada নামক এক ধরনের ড্রাগ বা ওষুধ অনুমোদন করেছে যা এইচ আই ভি সংক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম সেই সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, যাদের এই অসুখটি হবার চূড়ান্ত সম্ভাবনা রয়েছে। (মেডিকেল নিউজ টুডে) (এফ ডি এ)

জুলাই ২০

* এক অতিকায় ভূগর্ভস্থ জলভান্ডার (Potable aquifer) আবিষ্কৃত হয়েছে নামিবিয়া'তে। এই 'aquifer' শত শত বছর ধরে সমগ্র নামিবিয়া বাসীর পানীয় জলের সংকট মেটাতে সাহায্য করতে পারবে। (বিবিসি)

জুলাই ২৫

* দি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনস্ আলফা ম্যাগনেটিক স্পেক্ট্রোমিটার যন্ত্রে ২০১১ সাল থেকে ধরা পড়েছে ১৮ বিলিয়ন কসমিক রে-এর মহাজাগতিক ঘটনা। (বিসিসি)

জুলাই ২৬

* বোন ম্যারো (অস্থিমজ্জা) বদল করে দুজন মানুষের এইচ আই ভি নিরাময় সম্ভব হয়েছে। (এন বি সি নিউজ)

জুলাই ২৭

* সুইস বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন যে পৃথিবীর চন্দ্র গঠিত হয়েছে বিশালাকৃতি, দ্রুতগতিসম্পন্ন গ্রহের সংঘর্ষের ফলে। (বিবিসি)

জুলাই ২৯

* ২০২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র বিশ্বজুড়ে ৫০ বিলিয়ন বৈদ্যুতিন যন্ত্রের তারবিহীন যোগাযোগ সম্ভব – বলছে নামী-দামী শিল্প সংস্থাগুলি। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

অগাস্ট ১

* বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন তাঁরা টিউমারের জন্য দায়ী ক্যান্সার কোষের সন্ধান পেয়েছেন। (নেচার)

অগাস্ট ২

* আন্টার্টিকার বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা ইওসিন যুগের (Eocene period) বহু পুরাতন অরণ্যের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন। এগুলো পাওয়া গেছে বরফের নীচ থেকে। এই ঘটনা প্রমাণ করে আজ যা দক্ষিণমেরু সেখানে ইওসিন যুগে সবুজ অরণ্যের অস্তিত্ব ছিল। (ডিসকভারি নিউজ)

অগাস্ট ৬

* নাসা'র মার্স সায়েন্স ল্যাবরেটরি মিশন-এর অন্তর্গত 'কিউরিওসিটি' মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করেছে সাফল্যের সাথে Mars' Gale জ্বালামুখে। (Los Angeles Times) (BBC)

* বিশ্বের প্রথম গভীর সমুদ্রে খননকার্য (ডিপ সি মাইনিং) করার অনুমতি দিয়েছে পাপুয়া নিউ গিনি সরকার। (দি গার্ডিয়ান)

অগাস্ট ৮

* নর্থ কেনিয়ার নৃতত্ত্ববিদ (অ্যানথ্রোপোলজিস্ট) আবিষ্কার করেছেন ২ মিলিয়ন বছর আগেকার মানুষের জীবাশ্ম। (বিবিসি)

অগাস্ট ১৩

* এক নতুন শ্রেণীর পলিমার আবিষ্কৃত হয়েছে যেটি ব্যাক্টেরিয়ার সংযোজন থেকে নিজেকে প্রতিহত করে। এই নতুন পদার্থটি হাসপাতালে সংক্রমণ ছড়ানোকে প্রতিহত করবে। (সায়েন্স ডেইলি)

অগাস্ট ১৬

* গবেষকরা এমন একটি যৌগ খুঁজে পেয়েছেন যেটি পুরুষের মধ্যে হরমোন বিহীন জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। (সায়েন্স ডেইলি)

অগাস্ট ২১

* এম আই টি'র গবেষকরা জানিয়েছেন জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অরগানিজম দ্বারা কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) এবং বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থকে Gasoline Compatible Transportation Fuel-এ রূপান্তরিত করা সম্ভব। (এম আই টি)

অগাস্ট ২৯

* বিজ্ঞানীরা দুটি নতুন এক্সোপ্ল্যানেট খুঁজে পেয়েছেন যারা একই সাথে একটি বাইনারি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। যা কিনা এযাবৎ প্রত্যক্ষ করা যায়নি। (Wired)

* গবেষণায় জানা গেছে – আন্টার্টিকায় বরফের তলায় প্রচুর মিথেন গ্যাস আবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। (বিবিসি) (দি গার্ডিয়ান)

* উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে ২০৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিশ্বের ৯ বিলিয়ন মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। (সায়েন্স ডেইলি)

* কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দূরবর্তী নক্ষত্র মন্ডলে এক বিশেষ ধরণের শর্করা অণু (সুগার মলিকিউল) গ্লাইকোঅ্যালডিহাইড আবিষ্কার করেছেন। এই অনুটি IRAS 16293 - 2422 নক্ষত্র মন্ডলের আশেপাশে পাওয়া গেছে। এটি পৃথিবী থেকে ৪০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। গ্লাইকোঅ্যালডিহাইড রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে সাহায্য করে। এই গবেষণার ফলে জটিল জৈব যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলো গ্রহ সৃষ্টির আগে গঠিত হয়েছে। (Space.com)

সেপ্টেম্বর ১

* নাসার বিজ্ঞানীরা বলেছেন – পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PAHs)-দের যদি ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম (ISM) পরিবেশে রাখা হয় তবে তারা হাইড্রোজেনেশন, অক্সিজেনেশন ও হাইড্রক্সিলেশন পদ্ধতির দ্বারা জটিল জৈব যৌগে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে এই পদ্ধতিটি হল প্রোটিন ও ডি এন এ-র একক যথাক্রমে অ্যামিনো অ্যাসিড ও নিউক্লিওটাইড সংশ্লেষণের প্রাথমিক ধাপ। (Space.com)

সেপ্টেম্বর ৬

* সিমোকিটা পেনিনসুলার অদূরে সমুদ্রে ২,১১১ মি (৬,৯২৬ ফুট) গভীরে খননকার্য করে জাপান এক নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করল। (সায়েন্স ডেইলি)

* গবেষকরা জানিয়েছেন আমেরিকা ক্ষুদ্রতম লেজার তরঙ্গের ব্যবহার করে, যার স্থিতিকাল ৬৭ অ্যাট্টোসেকেন্ড (attoseconds)। এই 'অ্যাট্টোসেকেন্ড সায়েন্স'-এর ব্যবহার করে ক্ষুদ্র মাইক্রোস্কোপিক মহাজাগতিক ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব যেমন নিজেদের কক্ষপথে ইলেকট্রনের স্থান পরিবর্তন করা। (বিবিসি)

সেপ্টেম্বর ১২

* ইউ কে-র গবেষকরা স্টেম সেল গবেষণার মাধ্যমে প্রাণীদের মধ্যে বধিরতার চিকিৎসায় সাফল্য অর্জন করেছেন। (বিবিসি)

সেপ্টেম্বর ১৮

* সুইডেনের ডাক্তাররা এই প্রথম মা থেকে মেয়ের মধ্যে জরায়ু স্থানান্তরিত করেছেন। (বিবিসি)

সেপ্টেম্বর ২৩

* তথ্য প্রেরণে জাপানের গবেষকরা এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। ফাইবারের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে এক পেটাবাইট তথ্য প্রেরণ করা যায় ৫০ কিলোমিটারের ঊর্ধ্বে। এটি ৫০০০ এইচ ডি টিভি ভিডিওকে প্রতি সেকেন্ডে একটা ফাইবারের মধ্যে দিয়ে পাঠানোর সমতুল্য। (এন আই টি)

সেপ্টেম্বর ২৬

* একদল বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণায় বার্ধক্যের সময়কালে পেশীর শক্তিক্ষয়ের কারণ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা সাধারণ ড্রাগের সাহায্যে একটি ইঁদুরের উপর এই পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং

সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। (Eurek Alert!)

সেপ্টেম্বর ২৭

* নাসার বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন কিউরিওসিটি মঙ্গল গ্রহে প্রাচীন জল প্রবাহের সন্ধান পেয়েছে। (নাসা)

অক্টোবর ৩

* বিজ্ঞানীরা বলেছেন ব্ল্যাক মাম্বা নামক বিষাক্ত সাপের বিষ প্রাকৃতিক ব্যাথা নিরোধক ওষুধের (পেইন কিলার) কাজ করে। (লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস)

অক্টোবর ৪

* এক নতুন প্রজন্ম চিকিৎসার মাধ্যমে সদ্যোজাত শিশুর জিনোম-এর অনুবর্তিতা ৫০ ঘন্টার মধ্যে সম্ভব। এই গবেষণার ফলে সাধারণ পদ্ধতি থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব। এই চিকিৎসার দ্বারা ৩,৫০০ প্রজনন ব্যাধির নিরাময় সম্ভব। এর ফলে সঙ্কটজনক শিশুদের চিকিৎসা সম্ভব। (টাইম)

* নিসান তাদের নতুন বৈদ্যুতিক, তারবিহীন গাড়ি NSC - 2015 তৈরী করেছে। এই গাড়িটি নিজে থেকে পার্কিং করতে পারবে, রাস্তার চিহ্নগুলিকে বুঝতে পারবে এবং গাড়ি চোর হতে সাবধান করতে পারবে। এর বাণিজ্যিক সংস্করণটি ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাজারে আসবে। (বিবিসি)

অক্টোবর ৯

* ২০১২-তে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন সার্জ হারোকে এবং ডেভিড জে ওয়াইনল্যান্ড যৌথভাবে। ওনারা যুগান্তকারী পরীক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন যার দ্বারা ইন্ডিভিজুয়াল কোয়ান্টাম সিস্টেম-এর পরিমাপ আরও নিপুণভাবে করা যাবে। তাঁদের এই কাজ ঘটনাক্রমে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-কে বাস্তবে করে দেখানো কাজকে প্রভূত সাহায্য করতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে। (নোবেল প্রাইজ কমিটি)

অক্টোবর ১০

* অ্যারিজোনা রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এমন একটি সফটওয়্যার বানালেন যেটি কিনা নগর-উপনগরীর (urban landscape) এমনকি এক একটি আলাদা আলাদা বাড়ি ও রাস্তা ধরে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমণকে পরিমাপ করতে সক্ষম হল। এর আগে বিজ্ঞানীরা কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমণ পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। (অ্যারিজোনা রাষ্ট্র বিদ্যালয়)

অক্টোবর ১১

* কোলেস্টেরল এবং রক্ত মধ্যস্থ লিপিডের উপর এযাবৎ সর্ববৃহৎ জিনগত অধ্যয়ন করে এক আন্তর্জাতিক সংস্থা জানাল যে তারা ২১ রকমের জিন বৈচিত্র্যকে নির্ধারণ করতে পেরেছে যা হৃদযন্ত্রের অসুখ ও বিপাকীয় গোলোযোগ ঘটিত অসুখের জন্য দায়ী। এই নির্ণয় এই সমস্ত কার্ডিয়োভাসকুলার অসুখের মতো মারণ রোগের বিরুদ্ধে ওষুধ ও চিকিৎসার পরিধিকে প্রসারিত করবে। (সায়েন্স ডেইলি)

অক্টোবর ১২

* বিজ্ঞানীরা দাবী করলেন চাঁদের মাটিতে যে জলের অণু পাওয়া গেছে তা আসতে পারে চাঁদের উপরিত্বকের সাথে সৌর বায়ুর (সোলার উইন্ড) বিক্রিয়ার ফলেই। (দৈনিক টেলিগ্রাফ)

অক্টোবর ১৫

* জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করলেন এমন একটি গ্রহের অস্তিত্বের ব্যাপারে যা কিনা সৌরজগতের নেপচুর গ্রহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও এর সূর্যের মতো চার চারটি নক্ষত্র রয়েছে। এযাবৎ যতগুলি নক্ষত্র জগৎ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে এটিই বিরলতম নক্ষত্রজগৎ যা একই সাথে চারটি নক্ষত্র দ্বারা গঠিত এবং যাকে ইংরাজিত Quadruple Star System বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। (io9)

অক্টোবর ১৭

* 'থানডার গড ভাইন' নামক একটি চীনা গাছ থেকে বিজ্ঞানীরা একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যা ইঁদুরের অগ্নাশয় টিউমারকে নির্মূল করে। শীঘ্রই এটি মানুষের উপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে। (ব্লুমবার্গ)

অক্টোবর ১৮

* ভ্রূণ অবস্থায় ইঁদুরের কিডনীর কোষ সংগ্রহ করে তা পরীক্ষাগারে বৃদ্ধি ঘটিয়ে কিডনীর সদৃশ 'অরগানয়েড' গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই সাফল্য থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আগামী দিনে রোগীর স্টেমসেলকে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষাগারে আস্ত একটা কিডনীই তৈরী করে ফেলা সম্ভব হবে। (নিউ সায়েন্টিস্ট)

অক্টোবর ২২

* বৃটিশ চিকিৎসকের একটি দল দূর-নিয়ন্ত্রক (রিমোট কন্ট্রোল্ড) 'দ্য ভিঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেম' ব্যবহার করে দেশের প্রথম রোবট নিয়ন্ত্রিত ওপেন হার্ট সার্জারি সম্পন্ন করেছেন। (বিবিসি)

অক্টোবর ২৫

* মাইক্রোসফ্ট বাজারে আনল উইন্ডোস ৮ যার অপারেটিং সিস্টেমটি গত ১৭ বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী উত্তরণ।

অক্টোবর ৩০

* নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে মঙ্গলগ্রহে পাঠানো কিউরিওসিটি লাল গ্রহের মাটির এক্স রে ডিফ্র্যাকশন বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন তাতে প্ল্যাজিওক্লেস ফেল্ডস্পার, পাইরক্সিন এবং অলিভিন-এর মতো খনিজ পদার্থ রয়েছে যার সাথে হাওয়াইয়ান আগ্নেয়গিরির ব্যাসল্ট পাথরের সাদৃশ্য রয়েছে।■

দ্বিতীয় বর্ষ❖সংখ্যা - ৪❖নভেম্বর ২০১২

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা

ঈশ্বর শব্দটি আইনস্টাইনের কাছে মানুষের দুর্বলতার অভিব্যক্তি

" Choose life: The Biblical call to revolt" নামক দার্শনিক গুটকাইন্ড লিখিত পুস্তকটি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন পড়েছিলেন। এই পুস্তকটি পড়ে আইনস্টাইন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখক গুটকাইন্ড কে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাডে লেখা এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন "ঈশ্বর শব্দটি আমার কাছে মানুষের দুর্বলতার উৎপাদন ও অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়। বাইবেলের সংকলিত লেখাগুলি সম্মনীয় কিন্তু আদিম কল্পকথা ও নেহাতই শিশু সুলভ।" [The word God is for me nothing more than the expression and product of human weakness, the Bible a collection of Honerable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation is no matter how subtle can (for me) change this."] বিজ্ঞানী আইনস্টাইন লিখিত এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি ছিল অপ্রকাশিত এবং একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভল্টে সুরক্ষিত। অতীতে পোস্ট অফিসের তারিখ ছাপ সহ এই চিঠিটি নিলামে বিক্রি হয়েছিল ৪০৪,০০০ ডলারে। বর্তমানে এই চিঠিটি আবার নিলামে তোলা হয়েছে এবং এবার নিলামের ডাক শুরু হবে ৪ লক্ষ ডলার থেকে।

এই খবরটি ওয়াশিংটন থেকে পি টি আই প্রচার করেছে এবং ইংরাজী দৈনিক 'দ্য হিন্দু'র ৬ই অক্টোবর ২০১২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ব বরেণ্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এই চিঠিটি বিজ্ঞানী হিসাবে ভাববাদী ধারণার বিরুদ্ধে তাঁর বস্তুবাদী চেতনার একটা বড় নমুনা হয়ে থাকবে। ■

পত্রিকা যে সমস্ত স্টলে পাওয়া যায়

- ❖ বুকমার্ক, কলেজস্ট্রীট, কোলকাতা
- ❖ মণীষা, কলেজস্ট্রীট, কোলকাতা
- ❖ টেলিফোন ভবনের বিপরীতের স্টলগুলিতে, কোলকাতা
- ❖ রাসবিহারী মোড়, কোলকাতা
- ❖ খড়দহ স্টেশন, উত্তর ২৪ পরগণা
- ❖ সোনারপুর স্টেশন স্টল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
- ❖ বিদিশা পেপার হাউস, তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে, শিলিগুড়ি
- ❖ ঠাকুরপুকুর ৩এ বাসস্ট্যান্ডের স্টল, কোলকাতা
- ❖ বেহালা ট্রামডিপোর স্টল, কোলকাতা
- ❖ পোড়া অশ্বত্থতলার মেজদার স্টল, কোলকাতা

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com